আল-উম্মাহ

মাসিক জার্নাল ■ বর্ষ ১ ■ সংখ্যা ৪ ■ আগস্ট ২০২৬ www.al-ummah.org

অপপ্রচার প্রতিরোধ ও মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে
‘আল-উম্মাহ’র বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রা

রোহিঙ্গা সংকট: প্রত্যাবাসন কি অধরাই থেকে যাবে?

আল-উম্মাহ
www.al-ummah.org

প্রবন্ধ জমাদানের নির্দেশিকা

আল-উম্মাহ এমন সু-লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানায় যা গভীরতা, স্পষ্টতা এবং বিশ্লেষণধর্মী দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সুসংগঠিত বিশ্লেষণ ও শক্তিশালী প্রেক্ষাপটগত বোঝাপড়া থাকতে হবে। আমরা বৈশ্বিক ভূরাজনীতি, মুসলিম বিশ্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বিস্তৃত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত রূপান্তর নিয়ে অবদান আহ্বান করি। জমা দেওয়ার আগে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত শর্তাবলী লক্ষ্য করুন:

- প্রবন্ধটি ১,০০০ থেকে ১,৩০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে এবং পরিষ্কার ও পরিমার্জিত বাংলায় লেখা থাকতে হবে।
- এতে যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপিত মতামত থাকতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।
- এটি অবশ্যই মৌলিক এবং পূর্বে অপ্রকাশিত হতে হবে। তথ্যের যথার্থতা, যথাযথ সূত্র প্রদান এবং বৌদ্ধিক সততা বজায় রাখার দায়িত্ব লেখকের।
- জমা দেওয়া সকল লেখা সম্পাদকীয় পর্যালোচনার আওতায় যাবে।
- স্পষ্টতা, শৈলী এবং দৈর্ঘ্যের জন্য প্রবন্ধ সম্পাদনার অধিকার আল-উম্মাহ সংরক্ষণ করে।
- প্রকাশ নিশ্চিত নয়।
- জমা দেওয়ার সময় লেখকের পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্তর্ভুক্ত করুন।
- জমা পাঠানোর ঠিকানাঃ info@al-ummah.org

কপিরাইট নোটিশ

আল-উম্মাহ ওয়েবসাইট এবং এর মুদ্রিত ও ডিজিটাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধ ও বিষয়বস্তু প্রযোজ্য কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষিত এবং আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের বৌদ্ধিক সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষিত।

অন্যথা উল্লেখ না থাকলে, এই প্রকাশনার কোনো অংশ পূর্ব লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ, বা কোনোভাবে প্রেরণ করা যাবে না– তা ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে হোক না কেন।

লেখা জমা দেওয়ার মাধ্যমে লেখক স্বীকার ও সম্মত হন যে, গ্রহণ ও প্রকাশের পর প্রকাশিত উপাদানের কপিরাইট আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের অধীনে থাকবে। পৃথক প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত সংশ্লিষ্ট লেখকের নিজস্ব এবং তা ফাউন্ডেশনের মতামতের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে মিল নাও থাকতে পারে।

আল-উম্মাহ : বৈশ্বিক মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির এক নতুন কণ্ঠস্বর

আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আমাদের সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও পরিকল্পনার পর আমরা জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে 'আল-উম্মাহ'র শুভ উদ্বোধন করতে পেরেছি।

আল-উম্মাহ একটি বহুভাষিক মাসিক সাময়িকী ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। ঢাকার ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন-এর অধীনে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' (সূরা আলে ইমরান)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পন্থায়।' (সূরা আন-নাহল)।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।' কোরআনের এই চিরন্তন নির্দেশনা ও নববী আদর্শকে সামনে রেখেই আল-উম্মাহর যাত্রা। এটি শুধু একটি প্রকাশনা নয়; বরং জ্ঞান, চিন্তা ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে একটি সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রয়াস।

আল-উম্মাহ ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য ও আধুনিক জ্ঞানচর্চার মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে চায়। আমাদের লক্ষ্য–একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক মিডিয়া ও বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা, যেখানে গবেষণা, নির্ভরযোগ্য সাংবাদিকতা, গভীর বিশ্লেষণ এবং নীতিনির্ধারণী আলোচনার সমন্বয় ঘটবে।

ইংরেজি, আরবি, বাংলা ও তুর্কিসহ একাধিক ভাষায় পরিচালিত এই প্ল্যাটফর্ম ভাষা ও ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে জ্ঞান ও চিন্তার আদান-প্রদানের সুযোগ তৈরি করবে। গভীর গবেষণাভিত্তিক কাজ, তথ্যনির্ভর সাংবাদিকতা এবং কৌশলগত নীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বিশ্বব্যাপী পাঠকের কাছে প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পৌঁছে দিতে চাই।

আল-উম্মাহ পাঁচটি মৌলিক নীতির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত–

স্বাধীনতা : সম্পাদকীয় নীতির ক্ষেত্রে শতভাগ স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা।

নিরপেক্ষতা : কোনো ফেরকা, দলীয় বিভাজন, আদর্শিক পক্ষপাত কিংবা রাজনৈতিক এজেন্ডার কাছে নতি স্বীকার না করা।

ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা : উগ্রতা, অন্ধ অনুসরণ ও বিভেদ সৃষ্টিকারী বক্তব্যের পরিবর্তে ভারসাম্যপূর্ণ, সংযত ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা।

সত্যনিষ্ঠা : তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা এবং একাডেমিক বস্তুনিষ্ঠতা ও সততার প্রতি অটল থাকা।

অন্তর্ভুক্তিমূলক মনোভাব : ভিন্ন মত, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও ভিন্ন চিন্তাধারার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং যুক্তিনির্ভর ও গঠনমূলক সংলাপের পরিবেশ তৈরি করা।

আমরা বিশ্বাস করি, বর্তমান বিশ্বে তথ্য ও জ্ঞান অন্যতম প্রধান শক্তি। কিন্তু বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও বৈশ্বিক তথ্যব্যবস্থা ও মূলধারার গণমাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব এখনো তার প্রাপ্য প্রতিনিধিত্ব থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত। মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশের গণমাধ্যম পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাব, প্রতিক্রিয়াশীল সাংবাদিকতা এবং চাঞ্চল্যনির্ভর সংবাদ পরিবেশনের মতো নানা সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি। এর ফলে বিশ্বপরিসরে মুসলিম সমাজ, রাষ্ট্র, চিন্তা ও বাস্তবতা সম্পর্কে একটি বড় ধরনের তথ্যঘাটতি তৈরি হচ্ছে।

আল-উম্মাহ সেই ঘাটতি পূরণের একটি আন্তরিক প্রয়াস। এটি কেবল আরেকটি মিডিয়া আউটলেট হয়ে উঠতে চায় না; বরং জ্ঞান, গবেষণা, প্রজ্ঞা ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে চায়।

আমাদের লক্ষ্য এমন একটি নতুন প্রজন্ম তৈরি করা, যারা সাংবাদিকতা, গবেষণা, চিন্তাচর্চা ও নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে পারবে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাস্তবতা–বিশেষ করে ভূরাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিবর্তনগুলোকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, জ্ঞানকে কেন্দ্র করে সংলাপ, মতের বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান এবং সত্য ও প্রমাণের প্রতি অবিচল অঙ্গীকারই একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর গড়ে তুলতে পারে। সেই বিশ্বাস ও প্রত্যয় থেকেই আল-উম্মাহর পথচলা।

আল্লাহ আমাদের এই প্রয়াস কবুল করুন, সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন এবং মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে এই উদ্যোগকে কার্যকর ভূমিকা রাখার তাওফিক দান করুন। ■

প্রধান সম্পাদক

আল-উম্মাহ

মা সি ক জা র্না ল

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ জাকির হোসেন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মাসুমুর রহমান খলিলী

সম্পাদনা সহযোগী
দ্বীন মোহাম্মাদ দুখু

ডিজাইন অ্যান্ড গ্রাফিক্স
মো. মনিরুজ্জামান

আল-উম্মাহ, একটি মাসিক জার্নাল, বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় পাওয়া যায়। প্রিয় লেখকবৃন্দ, আপনারা সমসাময়িক বিষয়াবলী, ইসলামী বিজ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা, ইতিহাস, এবং জননীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। আমরা ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় ১৩০০ শব্দের অনধিক মৌলিক ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানাই।
প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা:

info@al-ummah.org
www.al-ummah.org

مؤسسة الأمة
AL-UMMAH
FOUNDATION

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশনস (বিআইসিআরডি)
ঢাকা, বাংলাদেশ

মূল্য : ৫০ টাকা

বর্ষ ১ আগস্ট ২০২৬ সংখ্যা ৪

অপপ্রচার প্রতিরোধ ও মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে 'আল-উম্মাহ'র নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রা পৃ. ৪

১৪ মানবিকতা, গণমাধ্যম এবং উম্মাহর ভবিষ্যৎ: সম্মিলিত পুনর্জাগরণের রূপরেখা
১৮ রোহিঙ্গা সংকট একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ
২৬ বিকল্প মাইক্রোফাইন্যান্স : সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেরণা
২৯ আদিনা মসজিদ বিতর্ক: ইতিহাসকে রাজনীতিকরণ?
৩৫ রোহিঙ্গা: ভূগোলের অভিশাপ ও নিয়তির পরিহাস
৩৮ জাতিসংঘ সনদ, কাশ্মীর ও পক্ষপাতমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সংকট
৪১ আল-কারাওইয়িন : এক নারীর হাতে গড়া বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়
৪৮ মুসলিম বিশ্বের অকৃত্রিম বন্ধু জন এস্পোসিটো আর নেই
৫০ তাসখন্দ থেকে বিশ্বমঞ্চে: ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানের এক ঐতিহাসিক উদযাপন
৫৪ সীমান্ত শুল্ক ব্যবস্থার আধুনিকায়নে তুরস্ক-ইরাক ৩০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা

রোহিঙ্গা সংকট: প্রত্যাবাসন কি অধরাই থেকে যাবে? পৃ. ২০

বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের রোডমাপ প্রণয়ন পৃ. ১২

৫৬ ভারতে মুসলিম ধর্মীয় স্থান ভাঙচুরের অভিযোগ : আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্বেগ

৫৮ সিরীয় কারিগরের হাত ধরে টিকে আছে আলেপ্পোর ১,৪০০ বছরের কাঠের রিলিফ শিল্প

৬০ যুক্তরাষ্ট্রে নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারের পক্ষে বাড়ছে জনসমর্থন, বলছে জরিপ

৬২ গাজায় ক্ষুধা সংকট কিছুটা কমেছে, সহায়তা কমলে ফের বাড়ার আশঙ্কা

৬৫ যখন ইবাদত আচরণকে সংশোধন করে না

৬৮ যুক্তরাজ্যে ইসলামোফোবিয়া বাড়ছে, প্রতি পাঁচদিনে ১ মসজিদে হামলা

৭০ ইসরাইলি হামলার মধ্যে ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন ফিলিস্তিনিদের

১০ বছর পর: ব্যর্থ অভ্যুত্থান চেষ্টা যেভাবে নতুন তুরস্ক গঠন করেছে পৃ. ৪৪

প্রতিবেদক

অধ্যাপক ইয়াসিন আকতায়

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

মোহাম্মদ নাসির জাভেদ

গোলাম নবী ফাই, পিএইচডি

ড. শাহজাহান খান OAM

মাসুমুর রহমান খলিলী

ইসাম শেহাদাত

আল-উম্মাহ ডেস্ক

লেখকদের প্রকাশিত মতামত তাদের নিজস্ব। প্রকাশক এর জন্য কোনো দায়ভার গ্রহণ করে না।

পাঠকেরা এই জার্নালের বিষয়বস্তু ব্যবহার, পুনর্মুদ্রণ বা পুনরায় প্রকাশ করতে পারবেন; তবে শর্ত থাকে যে এর জন্য আমাদের কাছ থেকে পূর্বানুমতি নিতে হবে এবং আমাদের ওয়েবসাইটের একটি লিঙ্ক যুক্ত করতে হবে।

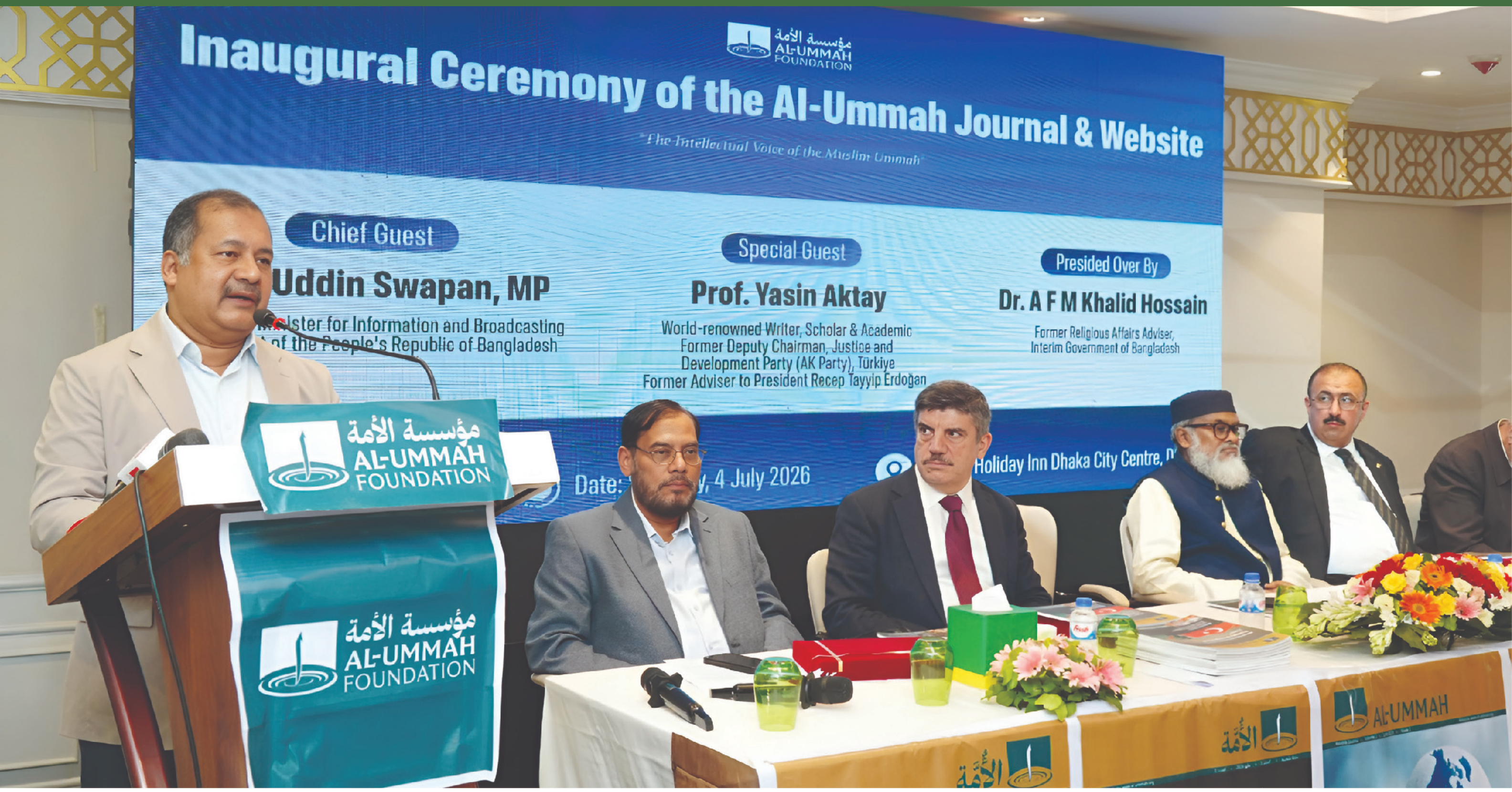

আল-উম্মাহ জার্নাল ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন

অপপ্রচার প্রতিরোধ ও মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে

‘আল-উম্মাহ’র নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক যাত্রা

আল-উম্মাহ ডেস্ক

মুসলিম বিশ্বের পারস্পরিক দূরত্ব নিরসন এবং ব্যাপক পরিসরে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও গঠনমূলক বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপকে জোরদার করার লক্ষ্যে ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করেছে বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম ‘আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন’। গত ৪ জুলাই ঢাকায় এক আয়োজনের মাধ্যমে এই নতুন বৈশ্বিক উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করা হয়।

অভিজ্ঞ সাংবাদিক ও অ্যাক্টিভিস্ট মোহাম্মদ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই উদ্যোগের অধীনে ‘আল-উম্মাহ’ শীর্ষক একটি বহুভাষিক সাময়িকী এবং এর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি

আল-উম্মাহর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য প্রদান করছেন আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং আল-উম্মাহ জার্নালের প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন

গবেষণা-নির্ভর সংলাপ জোরদার করা, ডিজিটাল অপপ্রচার মোকাবিলা করা এবং সমসাময়িক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের জ্ঞানভিত্তিক সমাধান প্রদানে আন্তর্জাতিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চায়।

রাজধানী ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাময়িকী ও ওয়েবসাইটটির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। দেশি-বিদেশি বিশিষ্ট রাজনৈতিক, সাংবাদিক ও অ্যাকাডেমিক ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে

'আল-উম্মাহ' জার্নাল উন্মুক্ত করছেন মাননীয় অতিথিবৃন্দ

বক্তব্য রাখছেন তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানের প্রাক্তন উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াসিন আকতায়

আয়োজিত এই অনুষ্ঠান আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ডিজিটাল বিভ্রান্তি প্রতিরোধে দায়িত্বশীল উদ্যোগ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। তিনি এ ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, 'বর্তমান ডিজিটাল যুগে তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ যেমন সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে, তেমনি বিভ্রান্তি, ভুয়া তথ্য ও সামাজিক বিভাজনের ঝুঁকিও বাড়িয়েছে। এই

অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, সাংবাদিক এবং গবেষকসহ বিপুল সংখ্যক দর্শকের সমাগম ঘটে।

পরিস্থিতিতে জ্ঞান, নৈতিকতা ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি।'

বর্তমান বিশ্ব এক গভীর ও জটিল সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বের সকল বৈচিত্র্য, ভিন্ন মত ও আদর্শের অবাধ আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই কেবল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব। আর এর জন্য প্রয়োজন চিন্তা ও বুদ্ধির স্বাধীন ও দায়িত্বশীল চর্চা।'

তথ্যের অতিপ্রবাহের যুগে নির্ভেজাল ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের অভাব রয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, 'আল-উম্মাহ' সাময়িকী বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক অঙ্গনের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক সংলাপ প্রতিষ্ঠার একটি কার্যকর মাধ্যম হবে।

বহুভাষিক প্রকাশনার প্রশংসা করে তিনি বলেন, সভ্যতার কল্যাণে সব মতের গবেষক ও পণ্ডিতদের একটি সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। অতীতে এককভাবে কোনো ব্যক্তি বা সমাজ বৈশ্বিক সংকটের স্থায়ী সমাধান দিতে পারেনি; বরং ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান জানিয়ে সহাবস্থানের সংস্কৃতির ওপরই টেকসই উন্নয়ন নির্ভর করে। বর্তমান সরকারের রূপকল্পের সাথে 'আল-উম্মাহ'র লক্ষ্য তুলনা করে তিনি উল্লেখ করেন, আন্তঃসাংস্কৃতিক বোঝাপড়া দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে সহায়তা করবে।

ঐতিহ্য ও আধুনিক নীতি-নির্ধারণের মেলবন্ধন

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি, প্রখ্যাত তুর্কি শিক্ষাবিদ ও প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোয়ানের সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াসিন আকতাই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, কৌশলগত ও সত্যভিত্তিক সহযোগিতার মাধ্যমে সচেতন সমাজ গঠনে এই প্ল্যাটফর্ম নতুন প্রজন্মের গবেষক ও তরুণ চিন্তাবিদদের উদ্বুদ্ধ করবে।

মুসলিম বিশ্বের ঐতিহাসিক বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য ও বর্তমান বাস্তবতার ব্যবধান উল্লেখ করে অধ্যাপক আকতাই বলেন, 'আজকের বিশ্বে মুসলিম সমাজের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো জ্ঞান, গবেষণা ও মাঠপর্যায়ের নীতি-নির্ধারণের

অতিথিগণ গবেষণা-ভিত্তিক সংলাপ ও বুদ্ধিবৃত্তিক নবায়ন বিষয়ে আল-উম্মাহর রূপকল্প মনোযোগ সহকারে শোনেন

অতিথিদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়

মধ্যে কার্যকর মেলবন্ধন তৈরি করা। শত শত বছর ধরে মুসলিম সভ্যতা জ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রেখেছে। সমসাময়িক বৈশ্বিক বাস্তবতায় সেই ঐতিহ্যের সাথে বর্তমান প্রজন্মের কার্যকর সংযোগ জোরদার করা প্রয়োজন।'

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. এ এফ এম খালিদ হোসেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-চালিত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে 'জ্ঞানভিত্তিক নেতৃত্ব' ও দায়িত্বশীল গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

আবেগের ঊর্ধ্বে বস্তুনিষ্ঠ রূপরেখা

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন জানান, রাতারাতি বিশ্ব বদলে

দেওয়ার কোনো দাবি তারা করছেন না। বরং স্থায়ী ও ইতিবাচক পরিবর্তন শুরু হয় জ্ঞান, গঠনমূলক সংলাপ এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে।

তিনি উল্লেখ করেন, আল-উম্মাহ তাৎক্ষণিক কোনো আদর্শিক পরিবর্তনের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব তৈরিতে বেশি মনোযোগী। প্রজ্ঞা, সততা ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে নতুন প্রজন্মের চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষকদের অনুপ্রাণিত করাই এই প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য।

বহুমাত্রিক আলোচনা ও আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ

আন্তর্জাতিক নীতি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও ডিজিটাল উদ্ভাবকদের এই সমাগমে সমসাময়িক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল:

- মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব।
- জেনারেটিভ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (AI) যুগে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা।
- গ্লোবাল সাউথের শিক্ষা কাঠামোর আধুনিকায়ন।
- ইসলামিক ফাইন্যান্স ও প্রযুক্তি-চালিত জ্ঞান উৎপাদনের প্রভাব।
- অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন (ওআইসি) ভুক্ত দেশগুলোর কৌশলগত সহযোগিতা।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী মুনির সাঈদ (ইসলামিক ওয়ার্ল্ড ফোরাম ফর থট অ্যান্ড সিভিলিজেশন), ড. আয়মান জাইদান (ইন্টারন্যাশনাল আল-কুদস ফাউন্ডেশন) এবং ড. ফাতিহ আবদুল কাদির (আল-রাওয়াদ একাডেমি, ইস্তাম্বুল)। এছাড়া স্থানীয় অতিথিদের মধ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্যানেলের পক্ষে ইসাম শেহাদাত এবং রাহমি ওসমান কাচমাজ প্ল্যাটফর্মটির ডিজিটাল রূপান্তরের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রভাব ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বর্তমানে 'আল-উম্মাহ' বাংলা, ইংরেজি, আরবি এবং তুর্কি–এই চার ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। আয়োজকরা জানান, ভবিষ্যতে বৈশ্বিক সংযোগ বাড়াতে আরও কয়েকটি ভাষা যুক্ত করা হবে। আন্তর্জাতিক বিষয়ক গবেষণাপত্র, বিশ্লেষণাত্মক নিবন্ধ, নীতিপত্র (পলিসি পেপার), মতামত ও বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মটি ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করতে চায়।

ভূরাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির ওপর গবেষণাভিত্তিক আলোচনার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে আল-উম্মাহর এই আত্মপ্রকাশ মুসলিম বিশ্বকেন্দ্রিক আলোচনাগুলোকে আবেগী প্রতিক্রিয়া থেকে বের করে এনে বস্তুনিষ্ঠ ও পর্যালোচনাভিত্তিক বিশ্লেষণের দিকে নিয়ে যেতে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। ■

কে কী বলেছেন

আল-উম্মাহ ডেস্ক

জহির উদ্দিন স্বপন

জহির উদ্দিন স্বপন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, বাংলাদেশ

“জ্ঞান, নৈতিকতা এবং দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের ভিত্তির ওপর নির্মিত বিশ্বাসযোগ্য বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেশি।”

অধ্যাপক ইয়াসিন আকতায়

অধ্যাপক ইয়াসিন আকতায়

রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা

“মুসলিম বিশ্বের একটি সমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য রয়েছে। সমসাময়িক বৈশ্বিক বাস্তবতার সাথে সেই জ্ঞানচর্চার সংযোগকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। গবেষণা, সংলাপ এবং সহযোগিতামূলক চিন্তার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে গবেষক ও তরুণ চিন্তাবিদদের সংযুক্ত করার জন্য আল-উম্মাহ একটি কার্যকর মঞ্চ হতে পারে।”

ড. এ এফ এম খালিদ হোসেন

ড. এ এফ এম খালিদ হোসেন

বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা

“এই মঞ্চটি ওআইসি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কৌশলগত সংযোগ ও সহযোগিতা তৈরিতে এবং মুসলিম উম্মাহর সমসাময়িক চ্যালেঞ্জগুলোর জ্ঞানভিত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমাধান খুঁজে বের করতে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।”

ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া

ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া

সাবেক সদস্য, অন্তর্বর্তী সরকারের ঐকমত্য কমিশন, বাংলাদেশ

“একটি অ্যাকাডেমিক জার্নাল প্রতিষ্ঠা করা শুধু একটি প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য নয়। এটি জ্ঞানচর্চা, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং মানব সভ্যতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ। ইতিহাস সাক্ষী যে, মুসলমানরা সম্পদ বা ক্ষমতার কারণে নয়, বরং জ্ঞান, মুক্তচিন্তা এবং সত্য অনুসন্ধানের চেতনার কারণেই বিশ্ব সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছিল।”

ড. নিয়াজ আহমেদ খান

ড. নিয়াজ আহমেদ খান

সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

“রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে আমরা দীর্ঘদিন ধরে সমাজকে অকারণে বিচ্ছিন্ন ও সংকীর্ণ করে রেখেছি। তাই, এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলো আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা, সংলাপ এবং ঐক্যের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করে।”

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

চেয়ারম্যান, আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন; প্রধান সম্পাদক, আল-উম্মাহ

“আমরা চাই এই প্ল্যাটফর্মটি গবেষণা, গঠনমূলক সংলাপ এবং জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের চিন্তাবিদ, লেখক এবং গবেষকদের অনুপ্রাণিত করুক।”

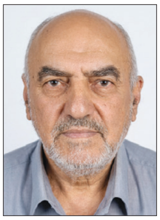

প্রকৌশলী মুনির সাঈদ

প্রকৌশলী মুনির সাঈদ

উপ-মহাসচিব, ইসলামিক ওয়ার্ল্ড ফোরাম ফর থট অ্যান্ড সিভিলাইজেশন

"বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর জন্য জ্ঞানভিত্তিক এবং গবেষণা-চালিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে বিভেদ ও অনৈক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। ক্ষমতার অভাবে নয়, বরং ঐক্যের অভাবে মুসলিম বিশ্ব বারবার সংকটে পড়েছে।"

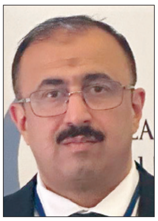

আইমান জেইদান

আইমান জেইদান

নির্বাহী পরিচালক, আন্তর্জাতিক আল-কুদস ফাউন্ডেশন

"ফিলিস্তিনে চলমান মানবিক বিপর্যয় বেদনাদায়ক। প্রায় ২০০ কোটি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনের জনগণ আজও ভয়াবহ দুর্ভোগের সম্মুখীন। এটি দেখায় যে আমাদের মূল সংকট সংখ্যার অভাব নয়, বরং পারস্পরিক অনৈক্য এবং সমন্বয়ের অভাব।"

অধ্যাপক ড. এম আবদুল আজিজ

অধ্যাপক ড. এম আবদুল আজিজ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি)

"মুসলিম বিশ্বের চলমান সংকট মোকাবিলায় বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে 'আল-উম্মাহ' উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি জোরদারে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। এই মহৎ উদ্যোগের সফলতা ও সার্থকতা কামনা করছি।"

ড. ফাতিহ্ আব্দুল কাদির

ড. ফাতিহ্ আব্দুল কাদির

আল-রাওয়াদ একাডেমি, ইস্তাম্বুল

"মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কার্যকর ঐক্য, সহযোগিতা এবং জ্ঞানভিত্তিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া ফিলিস্তিন সংকটের একটি টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত সমাধান সম্ভব নয়। আমাদের অবশ্যই বিভাজনের পথে নয়, ঐক্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সংলাপকে অগ্রভাগে রেখে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে হবে।"

ইসাম শেহাদাত

ইসাম শেহাদাত

সিনিয়র এডিটর, ডেইলি সাবাহ, ইস্তাম্বুল

"চারটি ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করার অর্থ হলো, প্রতিটি সংস্করণে একটি একক সম্পাদকীয় পরিচয় ও দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে বিভিন্ন লিখন ঐতিহ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। আল-উম্মাহর সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো এর লক্ষ্য ও দলের প্রতি মানুষের আস্থা। প্রথম সংখ্যার প্রত্যেক অবদানকারী শুধু একটি প্রবন্ধই লেখেননি–তাঁরা পত্রিকাটির ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করেছেন।"

রাহমি ওসমান কাচমাজ

রাহমি ওসমান কাচমাজ

আল-উম্মাহ ওয়েবসাইটের স্ট্র্যাটেজিক ডিজাইন পার্টনার

"আমরা আল-উম্মাহ জার্নালকে শুধু একটি সংবাদ প্ল্যাটফর্মের চেয়েও বেশি কিছু হিসেবে তৈরি করেছি। আমাদের লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী উম্মাহর জন্য একটি বিশ্বস্ত ডিজিটাল ঠিকানা তৈরি করা, যেখানে সত্য সুরক্ষিত থাকবে, জ্ঞান বিনিময় হবে এবং মানুষ ভাষা ও সীমানা পেরিয়ে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকবে। এই সূচনাটি এমন একটি প্ল্যাটফর্মের কেবল শুরু, যা আগামী প্রজন্মকে সেবা দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে।" ■

বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের রোডমাপ প্রণয়ন

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
চেয়ারম্যান, আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন
প্রধান সম্পাদক, আল-উম্মাহ

বর্তমান বিশ্ব এক গভীর কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ, ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, আঞ্চলিক সংঘাত, পরিবেশগত পরিবর্তন এবং সামাজিক রূপান্তর বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে এক নতুন অবয়ব দিচ্ছে।

এমন এক সংকটময় পরিস্থিতিতে, প্রায় ২০০ কোটি জনসংখ্যার মুসলিম উম্মাহ আজ এক জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানমনস্ক এবং সভ্যতার ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, বিশ্বজুড়ে জ্ঞান ও তথ্যের প্রাঙ্গণে মুসলিম বিশ্বের উপস্থিতি ও প্রতিনিধিত্ব এখনো অত্যন্ত অপ্রতুল।

এখানে চ্যালেঞ্জ যেমন বিশাল, তেমনি সম্ভাবনার দিগন্তও উন্মুক্ত। আর এই দুইয়ের মধ্য থেকেই আমাদের উত্তরণের পথরেখা এঁকে নিতে হবে। এই সংকটগুলোকে দুর্বলতা হিসেবে না দেখে, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের আহ্বায়ক হিসেবে গ্রহণ করাই সময়ের দাবি। এসব চ্যালেঞ্জ স্পষ্ট করে দেয়–জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান, গবেষণানির্ভর জনমত গড়ে তোলা এবং এমন এক নতুন প্রজন্মের

গণমাধ্যমকর্মী ও প্রজ্ঞাবান নেতৃত্ব তৈরির আবশ্যকতা–যাঁরা মেধা, যোগ্যতা ও সততার সাথে সমসাময়িক বাস্তবতার মুখোমুখি হতে সক্ষম।

আমরা বিশ্বাস করি যে, তথ্যভিত্তিক আলোচনা, নিষ্ঠাপূর্ণ জ্ঞানচর্চা এবং গঠনমূলক সম্পৃক্ততাই পারে একটি আলোকিত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে অবদান রাখতে।

গণমাধ্যমের ভূমিকা ও বর্তমান সংকট

আমাদের অঞ্চলের গণমাধ্যম ব্যবস্থা সাধারণত কোনো ঘটনা ঘটার পর প্রতিক্রিয়া দেখায়, আগাম পূর্বাভাস বা কৌশলগত বিশ্লেষণ দিতে ব্যর্থ হয়। পর্যাপ্ত সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছাড়াই বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা এবং তথ্যসমৃদ্ধ সংলাপ ও দূরদর্শী চিন্তা উৎসাহিত করার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই মতভেদকে উস্কে দেওয়া এর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ফলে তথ্যের এমন এক শূন্যতা তৈরি হয়, যা বিশ্বমঞ্চের জটিল ঘটনাবলী গভীরভাবে বোঝার ক্ষেত্রে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার যৌথ সক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।

আমাদের সমাজে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ কিছু গুরুতর সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি–যেমন মানসম্মত সাংবাদিকতা ও গবেষণায় অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ, পেশাদার প্রশিক্ষণের ঘাটতি, সীমানা পেরিয়ে আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার অভাব, আন্তর্জাতিক তথ্যসূত্রের ওপর অন্ধ নির্ভরশীলতা এবং প্রায়শই বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের পরিবর্তে চাঞ্চল্যকর সংবাদের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক।

তদুপরি, ডিজিটাল বিপ্লব বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনলেও, ওআইসি (OIC) ভুক্ত দেশগুলোর অনেক সংবাদমাধ্যম এখনো আধুনিক প্রযুক্তি, বহুভাষিক তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক জ্ঞানভিত্তিক নেটওয়ার্কগুলোকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারেনি–যা বিশ্বমঞ্চে মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানকে সতেজভাবে তুলে ধরতে পারত।

ঠিক এই অপরিহার্য প্রয়োজনকে সামনে রেখেই 'আল-উম্মাহ' প্ল্যাটফর্মের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তথ্যজগতের ভিড়ে কেবল আরেকটি প্রথাগত মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা এর উদ্দেশ্য নয়; বরং জনমতের মানদণ্ডকে উন্নীত করা এবং মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক নবজাগরণে সরাসরি অবদান রাখাই এর মূল অঙ্গীকার।

আল-উম্মাহ রাতারাতি বিশ্বকে বদলে দেওয়ার অতিপ্রাকৃতিক দাবি করে না। বরং এটি এমন একটি সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ গড়ে তোলার দিকে একটি অর্থপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ নিতে চায়–যেখানে অজ্ঞতার ওপর জ্ঞান, চরমপন্থার ওপর সংযম এবং বিভেদের ওপর গঠনমূলক সংলাপ জয়ী হবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আল-উম্মাহর এই যাত্রা মূলত এক বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণ, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা এবং এমন এক ভবিষ্যতের প্রতি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ–যেখানে মুসলিম উম্মাহ বিশ্ব সভ্যতায় আত্মবিশ্বাসের সাথে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

যেহেতু যেকোনো সুদূরপ্রসারী যাত্রা একটিমাত্র পদক্ষেপ দিয়েই শুরু হয়, তাই আমরা গভীর আশা ও বিনম্রতার সাথে সেই প্রাথমিক কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি গ্রহণ করেছি। এখন সুশীল সমাজকেই মূল্যায়ন করতে হবে–তাদের কি এমন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর প্রয়োজন রয়েছে, যেখানে শিষ্টাচারের সাথে ভিন্নমত পোষণ করা যাবে, প্রজ্ঞার সাথে নতুন চিন্তাধারা পরীক্ষা করা যাবে এবং মানবতার কল্যাণে সত্য ও জ্ঞানের সাধনা হবে?

প্রশ্ন উঠতে পারে: কেন এই উদ্যোগ এখনই? কেন এই প্ল্যাটফর্ম এবং কেন একটি নতুন 'মিডিয়া ইকোসিস্টেম' বা গণমাধ্যম ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ল?

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ঘটনাবলীর দিকে তাকালে–বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের বিদ্যমান সংকটময় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে–সহজেই বোধগম্য হয় যে, উম্মাহর পক্ষ থেকে এমন একটি উদ্যোগ আরও আগেই নেওয়া উচিত ছিল। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য: নিজেদের ভেতর আত্মানুসন্ধান চালানো এবং বৈশ্বিক অঙ্গনে নিজস্ব অবস্থান সুদৃঢ় করা। এই ধরনের উদ্যোগের কার্যকারিতা কতটা সুদূরপ্রসারী, তা সময়ই বলে দেবে। তবে সেই লক্ষ্য অর্জনে আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও কৌশলগত সমন্বয় অব্যাহত রাখা অপরিহার্য। ■

মানবিকতা, গণমাধ্যম এবং উম্মাহর ভবিষ্যৎ: সম্মিলিত পুনর্জাগরণের রূপরেখা

ইয়াসিন আকতায়
তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগানের সাবেক উপদেষ্টা

মুসলিম বিশ্ব আজ এক জটিল ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এমন এক যুগে যখন আমরা অভূতপূর্ব সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, ঠিক তখনই অসাধারণ কিছু সম্ভাবনার সুযোগও আমাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে কেবল আনুষ্ঠানিক সম্মেলন বা প্রচলিত বৈঠকের গণ্ডি পেরিয়ে এমন সব স্থায়ী প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা অপরিহার্য, যা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব পুনর্বিবেচনা, পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার এবং সম্মিলিত কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে ভূমিকা রাখবে। আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক প্ল্যাটফর্মে জ্ঞান ও চিন্তার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে, যা যেকোনো একক রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক সংলাপের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকির হোসেন; তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগানের সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াসিন আকতায়; বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এম জহির উদ্দিন স্বপন; বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. এ এফ এম খালিদ হোসেনসহ অন্যান্য অতিথি। (বাঁ থেকে)

ছবি: আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন

আমি বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যা অসাধারণ সহনশীলতা, মানবিক প্রতিশ্রুতি, সামাজিক গতিশীলতা এবং নৈতিক নেতৃত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সমকালীন মুসলিম বিশ্বে খুব কম দেশই রয়েছে, যারা পরম ধৈর্য, সামাজিক সংহতি এবং ভবিষ্যতের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে এমন গভীর প্রতিকূলতা জয় করতে পেরেছে। বাংলাদেশ আজ প্রমাণ করেছে যে, কীভাবে সম্মিলিত জাতীয় সংকল্পের মাধ্যমে যেকোনো কঠিন সংকটকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করা সম্ভব।

আমাদের সভ্যতার মূল তিন স্তম্ভ—মানবিক সেবা, জ্ঞান সৃষ্টি এবং দায়িত্বশীল যোগাযোগকে একসূত্রে বাঁধতে পারে, এমন রূপান্তরকামী প্রতিষ্ঠানের আজ সর্বাধিক প্রয়োজন।

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের মধ্যে এই ইতিবাচক পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেওয়ার এবং এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মধ্যে কার্যকর সেতু গড়ে তোলার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলিম বিশ্বে রয়েছে বিশাল মানবসম্পদ, সমৃদ্ধ ইতিহাস, গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য এবং শক্তিশালী আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। আমাদের মূলত যোগ্যতার ঘাটতি নেই, ঘাটতি রয়েছে সমন্বয়ের; সম্ভাবনার অভাব নেই, অভাব রয়েছে সুসংগঠিত কাঠামোর; সহমর্মিতার অভাব নেই, অভাব রয়েছে সেই সহমর্মিতাকে সম্মিলিত কর্মে রূপ দেওয়ার টেকসই ব্যবস্থার। আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ হলো এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যা হৃদয় ও মস্তিষ্কের, আদর্শ ও কর্মের এবং স্থানীয় উদ্যোগের সাথে বৈশ্বিক প্রভাবের সুষম সমন্বয় ঘটাবে।

গণমাধ্যম ও সত্যের সংগ্রাম

বর্তমান যুগে 'তথ্য' হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক ক্ষমতার অন্যতম প্রধান উৎস। অতীতে আধিপত্য পরিমাপ করা হতো মূলত সামরিক শক্তি, ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ কিংবা অর্থনৈতিক সক্ষমতার বিচারে। কিন্তু আজ বয়ান বা 'ন্যারেটিভ' বাস্তবতাকে রূপ দেয়; মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত করে আন্তর্জাতিক নীতিকে; আর প্রচার মাধ্যমের মূলধারার গল্পগুলোই নির্ধারণ করে দেয়—কোন মানবিক সংকট বিশ্ববাসীর নজরে আসবে এবং কোনটি ধামাচাপা পড়ে থাকবে। মুসলিম বিশ্ব প্রায়ই কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় না, বরং আন্তর্জাতিক বয়ানের লড়াইয়েও ব্যাকফুটে থাকে। আমাদের বাস্তবতা বহুলাংশে অন্যের চশমা দিয়ে উপস্থাপিত হয়, আমাদের কণ্ঠস্বর আটকে পড়ে বিদেশি কাঠামোর ছাঁকনিতে, আর আমাদের জাতীয় ও সামাজিক অভিজ্ঞতাগুলো ভুলভাবে, অতিসরলীকৃত কিংবা পুরোপুরি বিকৃতভাবে চিত্রিত হয়।

এই সংকটটি কেবল জনসংযোগের নয়, বরং এটি সরাসরি ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্কিত। কারণ ন্যায়বিচারের পূর্বশর্ত হলো সত্য প্রকাশ, আর সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সঠিক প্রতিনিধিত্ব। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে সত্যের চেয়ে বিভ্রান্তি বা ভুল তথ্য দ্রুত বিস্তৃত হয়; যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের হাতে যোগাযোগের ক্ষমতা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি অপপ্রচারের নতুন নতুন চোরাবালিও তৈরি করেছে। যে সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলো সাধারণ নাগরিককে শক্তিশালী করতে পারত, সেগুলোই সমাজকে মেরুকৃত করছে; যে নেটওয়ার্ক মানবজাতিকে যুক্ত করতে পারত, তা-ই ছড়াচ্ছে বিদ্বেষ ও বিকৃতি।

আজ গণমাধ্যমের কাঁধে এক বিশাল ঐতিহাসিক দায়ভার। এটি জনমত গঠন করে, আন্তর্জাতিক নীতি-নির্ধারণী আলোচনাকে প্রভাবিত করে, মানবিক সাড়া জাগিয়ে

তোলে এবং সাংস্কৃতিক সংযোগ কিংবা বিভেদ তৈরি করে। মুসলিম সংবাদ মাধ্যমগুলোর সামনে এই চ্যালেঞ্জটি অত্যন্ত গভীর ও স্পর্শকাতর। আমাদের কেবল 'প্রতিক্রিয়াশীল' (Reactive) হলে চলবে না, বরং সক্রিয় ও দূরদর্শী (Proactive) কৌশল গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এমন সাংবাদিকতা চর্চা করতে হবে যা বস্তুনিষ্ঠ, পেশাদার, তথ্যভিত্তিক এবং নৈতিকভাবে সুদৃঢ়। যেকোনো রাজনৈতিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রোপাগান্ডা ও সস্তা উত্তেজনা সৃষ্টির প্রবণতা প্রতিহত করতে হবে এবং মানুষের মৌলিক মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। আমাদের কেবল দুঃখ-কষ্টের চিত্রই নয়, বরং মানুষের সহনশীলতা, সংকট উত্তরণের ইতিহাস, সাফল্য এবং চমৎকার সব সমাধানের গল্পও বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে হবে।

দীর্ঘকাল ধরে বৈশ্বিক গণমাধ্যমে মুসলিম সমাজের গল্প মানেই যুদ্ধ, সহিংসতা, অস্থিতিশীলতা আর সংকটের আখ্যান। অথচ আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছেন বিশ্বমানের বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা, শিল্পী, শিক্ষাবিদ ও মানবসেবীরা। এই ইতিবাচক অর্জনগুলো বৈশ্বিক শ্রোতা-দর্শকদের সামনে আসা প্রয়োজন। গণমাধ্যম এখন আর কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি প্রভাব বিস্তারের, আত্মপরিচয় গঠনের এবং সামাজিক পরিবর্তনের এক শক্তিশালী নিয়ামক। যারা বয়ান বা ন্যারেটিভ নিয়ন্ত্রণ করে, মূলত তারাই ভবিষ্যৎ নির্মাণ করে।

আল-উম্মাহ প্ল্যাটফর্মের গুরুত্ব

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় 'আল-উম্মাহ' মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। মুসলিম বিশ্বের কেবল সংখ্যাগতভাবে গণমাধ্যমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন গুণগতভাবে উন্নত ও রুচিশীল প্রতিষ্ঠানের–এমন মাধ্যমের, যা পেশাদারিত্বের পাশাপাশি সর্বোচ্চ নৈতিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দেবে। এই প্ল্যাটফর্মটি হতে পারে মানবিক সংকটের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, মুসলিম সমাজগুলোর পারস্পরিক সংযোগ সেতু, তরুণ বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, গবেষক ও উদ্ভাবকদের কণ্ঠস্বর জোরালো করার মাধ্যম এবং ডিজিটাল জ্ঞান উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। সর্বোপরি, এটি এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র হতে পারে যেখানে প্রজ্ঞা ও দায়িত্বশীলতার সাথে সত্য উদ্ভাসিত হবে।

এই প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য কেবল সংবাদ পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, বরং সচেতন নাগরিক ও দায়িত্বশীল সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা উচিত। জ্ঞান উৎপাদনকে এর মূল ভাবনায় স্থান দিতে হবে; গবেষণা প্রতিবেদন, ডিজিটাল প্রকাশনা, শিক্ষামূলক কনটেন্ট, অনলাইন সেমিনার, পডকাস্ট এবং বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। একই সাথে, মানবিক সহায়তার পক্ষে আওয়াজ তোলাকেও একটি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে বজায় রাখতে হবে। শরণার্থী, যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যন্ত্রণার কথা নিয়মিত নথিবদ্ধ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জাগ্রত করতে হবে–যাতে তাদের জীবনের গল্প কেবল পরিসংখ্যানের পাতায় হারিয়ে না যায়। তরুণদের ক্ষমতায়নে এই প্ল্যাটফর্মের ব্যাপক বিনিয়োগ করা উচিত, কারণ বিশ্বজুড়ে তরুণ জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশই মুসলিম। এই জনমিতিক বা ডেমোগ্রাফিক বাস্তবতা আমাদের জন্য একাধারে বিশাল সুযোগ এবং বিরাট চ্যালেঞ্জ–তা নির্ভর করছে আমরা কীভাবে তাদের গড়ে তুলছি তার ওপর। তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, মিডিয়া সচেতনতা, ডিজিটাল দক্ষতা এবং উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ, মেন্টরশিপ ও উপযুক্ত অবকাঠামো প্রয়োজন। যে প্রজন্ম কেবল জ্ঞান ভোগ করবে না, বরং নতুন জ্ঞান উৎপাদন করবে–তারাই বদলে দেবে আমাদের ভবিষ্যৎ। সবশেষে, এই প্ল্যাটফর্মটিকে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, থিঙ্ক ট্যাংক, গবেষণা কেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভবিষ্যৎ কোনো বিচ্ছিন্ন একক প্রতিষ্ঠানের নয়, বরং শক্তিশালী বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের।

বাংলাদেশ ও তুরস্ক : এক কৌশলগত ভ্রাতৃত্ব

বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যকার সম্পর্ক কেবল দুটি রাষ্ট্রের মধ্যকার আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নয়; এর মূল প্রোথিত রয়েছে অভিন্ন ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক স্মৃতি এবং যৌথ প্রত্যাশার গভীরে। তুর্কি জনগণ বাংলাদেশকে কেবল একটি বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্র হিসেবে দেখে না, বরং আমাদের ঐতিহাসিক স্মৃতিতে বাংলাদেশের স্থান অত্যন্ত গভীর। আনাতোলিয়া যখন দখলদারদের কবলে ছিল এবং তুর্কি জাতি যখন অস্তিত্ব রক্ষার চূড়ান্ত লড়াইয়ে লড়ছিল, তখন হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে বসবাসকারী এই ভূখণ্ডের মুসলিমরা সীমিত সামর্থ্য সত্ত্বেও অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের মাধ্যমে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা জুগিয়েছিল। সেই নৈতিক সমর্থনের তাৎপর্য বস্তুগত মূল্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি ছিল। এটি প্রমাণ করেছিল যে আমরা একা নই এবং উম্মাহর হৃদস্পন্দন আনাতোলিয়ার সাথে একসূত্রে স্পন্দিত হচ্ছিল। এক শতাব্দী পরেও সেই ঐতিহাসিক কৃতজ্ঞতা তুরস্কের মানুষ ভোলেনি।

আজ বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র মনে হয় না যে আমরা কোনো ভিনদেশে আছি; বরং মনে হয় আমরা নিজস্ব পরিমণ্ডলে ভাই-বোনদের মাঝে আছি, যাদের সাথে ইতিহাসজুড়ে আমরা আনন্দ ও বেদনা ভাগাভাগি করেছি। আমাদের ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সবচেয়ে মজবুত ভিত্তি হবে এই অভিন্ন ইতিহাস ও ভ্রাতৃত্ববোধ। আধুনিক ইতিহাসে উভয় দেশই গভীর সংগ্রাম দেখেছে, সার্বভৌমত্ব, উন্নয়ন ও জাতীয় মর্যাদার সন্ধান করেছে এবং আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করেছে।

উচ্চপর্যায়ের সফর, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, শিক্ষা বিনিময় এবং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও তুরস্কের কূটনৈতিক সখ্য প্রতিনিয়ত জোরদার হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে, উভয় দেশই ওআইসি (OIC) ও জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থায় সমন্বিতভাবে কাজ করে; বিশেষ করে মানবিক সহায়তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শান্তি, ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকার রক্ষায় দুই দেশের

দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। Cultural exchange বা সাংস্কৃতিক কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিনিময় দুই দেশের নতুন প্রজন্মের মাঝে চমৎকার মেলবন্ধন তৈরি করছে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়লেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এখনো বিপুল সম্ভাবনা অব্যবহৃত রয়ে গেছে। তৈরি পোশাক, অবকাঠামো উন্নয়ন, ম্যানুফ্যাকচারিং, তথ্যপ্রযুক্তি এবং শক্তি (জ্বালানি) খাতে যৌথ বিনিয়োগের বিপুল সুযোগ রয়েছে। উভয় দেশেরই রয়েছে অত্যন্ত গতিশীল বেসরকারি খাত, যা পারস্পরিক লাভজনক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম। প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে তুরস্কের অভাবনীয় অগ্রগতি এবং বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সামরিক আধুনিকায়ন ও কৌশলগত সক্ষমতার মেলবন্ধন এক নতুন সহযোগিতার দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। একইভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এবং মানবিক লজিস্টিকসের ক্ষেত্রে দুই দেশের যৌথ কাজ বৈশ্বিক স্তরে আমাদের সক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

তবে সবচেয়ে বড় সম্ভাবনার ক্ষেত্রটি লুকিয়ে আছে ভাবনার জগতে (Intellectual Domain)। মুসলিম বিশ্বের শুধু শক্তিশালী অর্থনীতিরই প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন জোরালো বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগ, শিক্ষামূলক অংশীদারিত্ব এবং শক্তিশালী মিডিয়া ইকোসিস্টেম। বাংলাদেশ ও তুরস্ক যৌথভাবে এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিতে পারে। আমরা এমন এক গবেষক, সাংবাদিক, চিন্তাবিদ ও উদ্যোক্তাদের সমন্বিত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারি, যারা সমকাল ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলোর উদ্ভাবনী সমাধান দিতে সক্ষম। তাই আমাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কেবল রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সুশীল সমাজের (People-to-People) যোগাযোগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা উচিত। কারণ দিনশেষে, রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের চেয়ে সমাজের গভীর বন্ধনই সবচেয়ে বেশি টেকসই হয়।

এক যৌথ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ

পৃথিবী আজ এক রূপান্তরকামী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বদলে দিচ্ছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) পাল্টে দিচ্ছে যোগাযোগের ধরণ, জলবায়ু পরিবর্তন তৈরি করছে নিত্যনতুন মানবিক সংকট এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা অস্থিতিশীল করে রাখছে বৈশ্বিক সীমান্তগুলোকে। এর মাঝেই বহু সমাজ নিজস্ব বিশ্বাস, পরিচয় এবং সংহতির সংকটে ভুগছে। মুসলিম বিশ্বও এই পরিবর্তনের বাইরে নয়; বরং বহু ক্ষেত্রে আমরা এই বৈশ্বিক রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতেই অবস্থান করছি।

এই বাস্তবতায় আমাদের এমন এক নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব প্রয়োজন, যারা নৈতিক মূল্যবোধের সাথে আধুনিক প্রযুক্তি ও বাস্তব দক্ষতার সমন্বয় ঘটাতে পারবেন; যারা ঐতিহ্য ও আধুনিকতা–উভয়কেই গভীরভাবে বুঝবেন; সংঘাত না বাড়িয়ে গড়ে তুলবেন সমন্বয়ের সেতু এবং ক্ষমতার সমান্তরালে প্রাধান্য দেবেন প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানকে।

অতীতমুখী ভাবালুতা কিংবা অন্ধ অনুকরণ দিয়ে ভবিষ্যৎ রচনা করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। আর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন 'আশা'–যা কেবল এক নিষ্ক্রিয় অনুভূতি নয়, বরং বর্তমানের সমস্ত কঠিন পরিস্থিতির মাঝে দাঁড়িয়ে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের সক্রিয় অঙ্গীকার।

মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস আমাদের শেখায় যে, পতন বা অবক্ষয় কখনোই কোনো জাতির জন্য স্থায়ী হয় না। সভ্যতার প্রতিটি পুনর্জাগরণ শুরু হয় নতুন যুগান্তকারী ভাবনা থেকে, প্রতিটি রূপান্তর ঘটে প্রজ্ঞাবান মানুষের হাত ধরে এবং প্রতিটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসে নিজস্ব মূল্যবোধ ও যোগ্যতার ওপর গভীর আস্থা থেকে। প্রশ্ন এটি নয় যে, মুসলিম বিশ্বের ঘুরে দাঁড়ানোর মতো শক্তি ও সম্পদ আছে কি না–অবশ্যই তা আছে। আসল প্রশ্ন হলো, আমরা সেই সম্পদগুলোকে সঠিকভাবে সমন্বিত করতে পারছি কি না; মূল্যবোধকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে এমন প্রতিষ্ঠান গড়তে পারছি কি না; এবং আমাদের সহমর্মিতাকে নীতিতে, জ্ঞানকে টেকসই উন্নয়নে এবং বিশ্বাসকে গঠনমূলক সামাজিক উদ্যোগে রূপান্তর করতে পারছি কি না। ■

ঢাকায় রোহিঙ্গাদের সংকট মোকাবিলা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক। ছবি : আল উম্মাহ ফাউন্ডেশন

রোহিঙ্গা সংকট একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ

একটি গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের টেকসই ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসনের জন্য বৈশ্বিক পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।

এম. নাসির জাওয়েদ

সাবেক সম্পাদক 'ইয়ারবুক অব দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড', নয়া দিল্লি

বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক সংকটগুলোর মধ্যে রোহিঙ্গা সংকট অন্যতম। মিয়ানমারের একটি জাতিগত জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের জাতিসংঘ 'বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত সংখ্যালঘু' হিসেবে অভিহিত করেছে, যার ফলে তাদের দুর্দশা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

বছরের পর বছর ধরে এই সংকটটি মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আইন, নিরাপত্তা এবং ভূরাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। তবে মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত ভাগাভাগি করার কারণে এই সংকটের সবচেয়ে বড় চাপ বহন করছে বাংলাদেশ।

২০১৭ সালের আগস্টে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ মিয়ানমারে ব্যাপক জাতিগত সহিংসতার শিকার হয়ে প্রায় ১৪ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম বাংলাদেশে পালিয়ে আসে এবং তখন থেকেই তারা কক্সবাজার অঞ্চলে বসবাস করছে। বাংলাদেশ অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে এই সংকটে সাড়া দিয়েছিল–যা অনেক দেশের জন্যই এক অনন্য দৃষ্টান্ত। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর)-এর মতে, বাংলাদেশ এখন "বিশ্বের সর্ববৃহৎ শরণার্থী শিবিরের" আশ্রয়নগরী।

তা সত্ত্বেও এই সংকট এখনো কাটেনি। দীর্ঘায়িত এই সংকট এখন কক্সবাজার ও ভাসানচরের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর চরম আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত চাপ সৃষ্টি করছে।

ইউএনএইচসিআর উল্লেখ করেছে যে, রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা অত্যন্ত জরুরি, কারণ বাংলাদেশে থাকা ৯৫ শতাংশ রোহিঙ্গা পরিবারই মানবিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। শিবিরের অর্ধেক বা অর্ধেকেরও বেশি শরণার্থী ১৮ বছরের কম বয়সী এবং তাদের শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও জীবিকার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার দিকে বিপজ্জনক সমুদ্রপথে জীবন ঝুঁকিতে ফেলছে, যে পথগুলোকে বিশ্বের অন্যতম প্রাণঘাতী পথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শরণার্থী জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশেরও বেশি নারী ও শিশু। মানব পাচার, আন্তঃদেশীয় অপরাধ এবং সামুদ্রিক পথের নিরাপত্তা ত্রুটির মতো সমস্যাগুলো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলছে।

গোলটেবিল বৈঠক : সংকটের গাম্ভীর্য এবং এর প্রতি বিশ্বের উদাসীন মনোভাব বিবেচনা করে সম্প্রতি দেশটির রাজধানী ঢাকায় "রোহিঙ্গা সংকট নিরসন: প্রত্যাবাসন কি এক দূরবর্তী স্বপ্ন?" শীর্ষক একটি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়।

বক্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, বাংলাদেশ একাই এই সংকট মোকাবিলা করে চললেও রোহিঙ্গা বিষয়টি ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ থেকে সরে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (BIIT) এবং সেন্টার ফর সিভিলিজেশনাল ডায়ালগ (CCD)-এর যৌথ উদ্যোগে গত ৬ জুলাই আয়োজিত এই সম্মেলনে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ, সম্মানজনক ও টেকসই প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়। বৈঠকে বিশ্বজুড়ে বিপুল সংখ্যক পণ্ডিত, সাংবাদিক, গবেষক, মানবাধিকার কর্মী, কূটনীতিক, শিক্ষাবিদ এবং বিভিন্ন থিঙ্ক ট্যাংকের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট তুর্কি শিক্ষাবিদ, সামাজিক চিন্তাবিদ এবং তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগানের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াসিন আকতাই। তিনি বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের মানবিক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই ইস্যুতে ঢাকার প্রতি তুরস্কের সমর্থনের আশ্বাস দেন।

"বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও অংশীদারিত্ব রয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় তুরস্ক সব সময় বাংলাদেশের পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।"

অধ্যাপক ইয়াসিন আকতাই বলেন, তুরস্ক রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছায় এবং সম্মানজনক প্রত্যাবাসনের পক্ষে কাজ করে। একইসাথে তিনি শরণার্থীদের খাদ্য সহায়তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ মানবিক কর্মকাণ্ড জোরদার করার আশ্বাস দেন।

বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন সিসিডি (CCD)-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. এম. আবদুল আজিজ। তিনি রোহিঙ্গা ট্র্যাজেডিকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রধান মানবিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে অভিহিত করেন।

ড. আজিজ বলেন, "এই বিষয়টি এখন আর দুটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক আইন, নিরাপত্তা এবং ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে যুক্ত এক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জে রূপ নিয়েছে।" তিনি একটি স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে থিঙ্ক ট্যাংক ও সুশীল সমাজের মধ্যে বৈশ্বিক সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন।

এই গোলটেবিল বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ জাকির হোসেন, চেয়ারম্যান, আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন ও প্রধান সম্পাদক, আল-উম্মাহ জার্নাল; ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন); অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, সাবেক উপাচার্য, গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি; অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফাজলী ইলাহী, সাবেক উপাচার্য, ইউআইটিএস (UITS); ড. নাফিস মোহাম্মদ নাসরুল্লাহ, সাবেক উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; ড. আবুল হাসান এম. সাদেক, প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি; ইসাম শেহাদাত, সিনিয়র এডিটর, ডেইলি সাবাহ (তুরস্ক); ড. আইমান জাইদান, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল, আল-কুদস ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন; কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ আবদুল হক; মোস্তফা কামাল মজুমদার, সাবেক সম্পাদক, দ্য নিউ নেশন; মাসুদ মান্নান, তুরস্কে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত; এবং অধ্যাপক ড. আবদুল লতিফ মাসুম, সাবেক উপাচার্য, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে একপাশে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তারা সতর্ক করে বলেন, দীর্ঘায়িত এই সংকট দ্বিপাক্ষিক বিষয়ের চেয়ে একটি বৈশ্বিক মানবিক ও নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। তাই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপদ, স্বেচ্ছায় ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে তারা জোরালো আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের আহ্বান জানান।

সম্মেলনে জাতিসংঘ, আসিয়ান (ASEAN) এবং ওআইসি (OIC)-কে তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা জোরদার করার তাগিদ দেওয়া হয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ফোরামগুলোতে তুরস্ককে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা হলো একটি মুসলিম জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, যারা শত শত বছর ধরে মিয়ানমারে (সাবেক বার্মা) বসবাস করে আসছে। বংশানুক্রমে মিয়ানমারে বসবাস করা সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের কোনো সরকারি জাতিগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি এবং ১৯৮২ সাল থেকে তাদের নাগরিকত্ব বঞ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে তারা বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। ■

রোহিঙ্গা সংকট:

প্রত্যাবাসন কি অধরাই থেকে যাবে?

ইয়াসিন আকতায়

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগানের সাবেক উপদেষ্টা

"ইতিহাস বাংলাদেশকে এমন এক মানবিক জাতি হিসেবে মনে রাখবে, যেটি নিপীড়িত মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি—এমন এক সময়ে, যখন বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ কেবল দূর থেকে সহানুভূতি দেখিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছিল।"

বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী বাস্তুচ্যুতি সংকটের মানবিক মূল্য রোহিঙ্গা শিশুরা বহন করে।

বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলো নিরাপত্তা ও মৌলিক চাহিদার সন্ধানে শরণার্থী শিবিরগুলোর মধ্য দিয়ে পথ করে নেয়।

রোহিঙ্গা সংকট কেবল কোনো আঞ্চলিক সমস্যা নয়; এটি আমাদের সমগ্র মানবজাতির জন্য এক বিরাট পরীক্ষা। এটি ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়বদ্ধতাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। একই সাথে এই মূল নীতিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে যে-কোনো জনগোষ্ঠীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাষ্ট্রহীনতা, বাস্তুচ্যুতি এবং চরম অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া যায় না।

আমি বাংলাদেশের এই অসাধারণ ও ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। নিজস্ব অজস্র অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং বিপুল জনসংখ্যার চাপ থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশ মিয়ানমারের সহিংসতা ও নিপীড়ন থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসা এক মিলিয়নেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। এই ধরনের ঐতিহাসিক মানবিক সিদ্ধান্ত কেবল রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ বা কৌশলগত স্বার্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না; এটি নিছক নীতি-কৌশলের ঊর্ধ্বে গিয়ে দুর্বল ও অসহায় মানুষের প্রতি এক গভীর মানবিক দায়বদ্ধতার অনন্য বহিঃপ্রকাশ।

ইতিহাস বাংলাদেশকে কেবল একটি আশ্রয়দাতা দেশ হিসেবেই স্মরণ করবে না; বরং এমন এক মহান জাতি হিসেবে মনে রাখবে, যা নিপীড়িত মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতে দ্বিধা করেনি–এমন এক সংকটে, যখন বিশ্বের বেশিরভাগ শক্তি দূর থেকে কেবল ফাঁপা সহানুভূতি দেখিয়েই ক্ষান্ত ছিল।

একজন তুর্কি শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ হিসেবে আমি যখনই রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে ভাবি, তখনই শরণার্থী ব্যবস্থাপনায় তুরস্কের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। গত দেড় দশকে তুরস্ক লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, বিশেষ করে যারা সিরিয়ার ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ থেকে জীবন বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছিল। একপর্যায়ে তুরস্ক প্রায় ৪০ লাখ সিরীয় শরণার্থীর আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়, যা দেশকে বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী আশ্রয়দাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

আজকের বাংলাদেশের মতোই তুরস্ককেও তৎকালীন সময়ে বিশাল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক স্বার্থের চেয়ে মানুষের জীবন রক্ষা করাকে প্রাধান্য দেওয়ার নীতিতেই তুরস্ক অবিচল ছিল। ফলে লাখ লাখ সিরীয় সেখানে নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল।

অবশ্যই, এত বিপুল পরিমাণ শরণার্থী আশ্রয়ের অভিজ্ঞতা কখনোই সমস্যা মুক্ত হয় না। সামাজিক সংহতি, অর্থনৈতিক চাপ, অভ্যন্তরীণ জনমত এবং নিরাপত্তার নানা জটিল প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই সামনে চলে আসে। তুরস্ককে এসব চরম বাস্তবতার মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছে, আর বাংলাদেশও আজ একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি। তবে সব বাধা অতিক্রম করে উভয় দেশই বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে–মানবিক দায়িত্ববোধ কেবল ফাঁকা বুলি বা স্লোগান নয়, এটি একটি

WHO ARE ROHINGYA?

The military attack on the minority Muslim community in August 2017 was described as "a textbook example of ethnic cleansing" by the UN while several rights groups and other international bodies called the systematic human rights violations against and mass killing of Rohingya a "genocide" and "crime against humanity".

ETHNIC CLEANSING AND CRIME AGAINST HUMANITY

On Aug. 25, 2017 Rohingya faced an inhuman military clampdown -- termed ethnic cleansing and a crime against humanity -- forcing more than 750,000 of them to flee to neighboring Bangladesh.

THE ROHINGYA ARE

The Rohingya are primarily Muslims who live in Buddhist-majority Myanmar's Rakhine state.

OVER 3.6 MILLION PEOPLE

They are made up of over 3.6 million people who have been rendered stateless and face discrimination in Myanmar.

MYANMAR DOES NOT RECOGNIZE THE ROHINGYA

The government of Myanmar does not recognize the Rohingya among the country's 135 official ethnic groups.

IMPORTANT CHRONOLOGY

Muslims came to Arakan, now Rakhine State, an independent coastal kingdom in today's Myanmar, starting in the 1430s

Small number of Muslims lived in the region when Burmese (now Myanmar) empire conquered it in 1784.

Britain occupied Burma starting in 1824 until 1948, Buddhist-majority country gained its freedom.

1962: Myanmar launches state-sponsored persecution under "Operation Dragon King" targeting the Rohingya people.

1978: Following **"Operation Clean and Beautiful Nation,"** nearly **200,000 Rohingya begin fleeing** en masse to neighboring Muslim-dominated Bangladesh

1990: and nearly 200,000 more Rohingya reach Bangladesh.

2012: Myanmar forces renew targeting of Rohingya in which more than 200 people are killed and another 150,000 made homeless

IN THE YEAR 2019

Myanmar announces on Aug. 15 that it has "cleared 3,450 people to make the journey home from a list of more than 22,000 refugees provided by Bangladesh."

WHERE ARE ROHINGYA FLEEING TO?

Bangladesh, Thailand, Malaysia, Pakistan, Indonesia, Saudi Arabia, India, Japan, Nepal, Sri Lanka, the U.S., Canada and some European countries

NEW HOME: COX'S BAZAR, BANGLADESH:

There are now around 1.6 million refugees living in Bangladesh, mainly in squalid camps in Cox's Bazar

বাস্তব অঙ্গীকার, যার জন্য প্রয়োজন ত্যাগ ও দৃঢ়তা।

সিরিয়া ও রোহিঙ্গা সংকটের মধ্যে একটি গভীর মিল রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই কেবল মানবিক সহায়তা দিয়ে কোনো স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। কারণ, শরণার্থীরা চিরকাল আন্তর্জাতিক দান-খয়রাতের ওপর নির্ভর করে বাঁচতে চায় না। ত্রাণ বা সহায়তা হয়তো সাময়িক কষ্ট লাঘব করতে পারে, কিন্তু তা কখনোই নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা, আত্মমর্যাদা এবং নিজ পরিচয়ের বিকল্প হতে পারে না।

আর এটাই আমাদের আজকের আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে উপনীত করে: প্রত্যাবাসন কি সত্যিই এক অধরা স্বপ্ন?

প্রত্যাবাসন কখনোই কোনো বিস্মৃত বা কাল্পনিক স্বপ্ন হওয়া উচিত নয়; আবার মাঠপর্যায়ের বাস্তবতাহীন কোনো অবাস্তব স্লোগানও এটি হতে পারে না।

সিরিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কেবল তখনই টেকসই হতে পারে, যখন কয়েকটি মৌলিক শর্ত পূরণ হয়: নিরাপত্তা, আইনি গ্যারান্টি, নিপীড়ন থেকে স্থায়ী সুরক্ষা, অধিকার পুনরুদ্ধার, জীবিকার সংস্থান এবং ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা। এই শর্তগুলো নিশ্চিত না করে প্রত্যাবাসন করার চেষ্টা করা হলে তা সাময়িক, অস্থিতিশীল এবং ঝুঁকিপূর্ণ হতে বাধ্য। এই একই নীতি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

প্রত্যাবাসন মানে শুধু সীমান্ত পার হয়ে অন্য দেশে চলে যাওয়া নয়। এর আসল অর্থ হলো—স্বীকৃত অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে সমঅধিকারভিত্তিক নাগরিক হিসেবে নিজ ভিটায় ফিরে যাওয়া। নাগরিকত্ব, আইনি পরিচিতি, নিরাপত্তার সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা এবং বৈষম্যহীন জীবনযাত্রার বিষয়টি উপেক্ষা করে প্রত্যাবাসনের যেকোনো আলোচনা মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ারই নামান্তর।

তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর কেবল ত্রাণ দেওয়ার চেয়েও অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়। মানবিক সহায়তা জরুরি, তবে তা কখনোই রাজনৈতিক সমাধানের বিকল্প হতে পারে না। বিশ্বের পরাশক্তিগুলোকে মিয়ানমারের ওপর নিরবচ্ছিন্ন কূটনৈতিক চাপ বজায় রাখতে হবে এবং এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায়, নিরাপদে, মর্যাদার সাথে এবং টেকসই উপায়ে নিজ দেশে ফিরতে পারে।

একই সাথে, আঞ্চলিক অংশীদারদেরও অত্যন্ত সক্রিয়

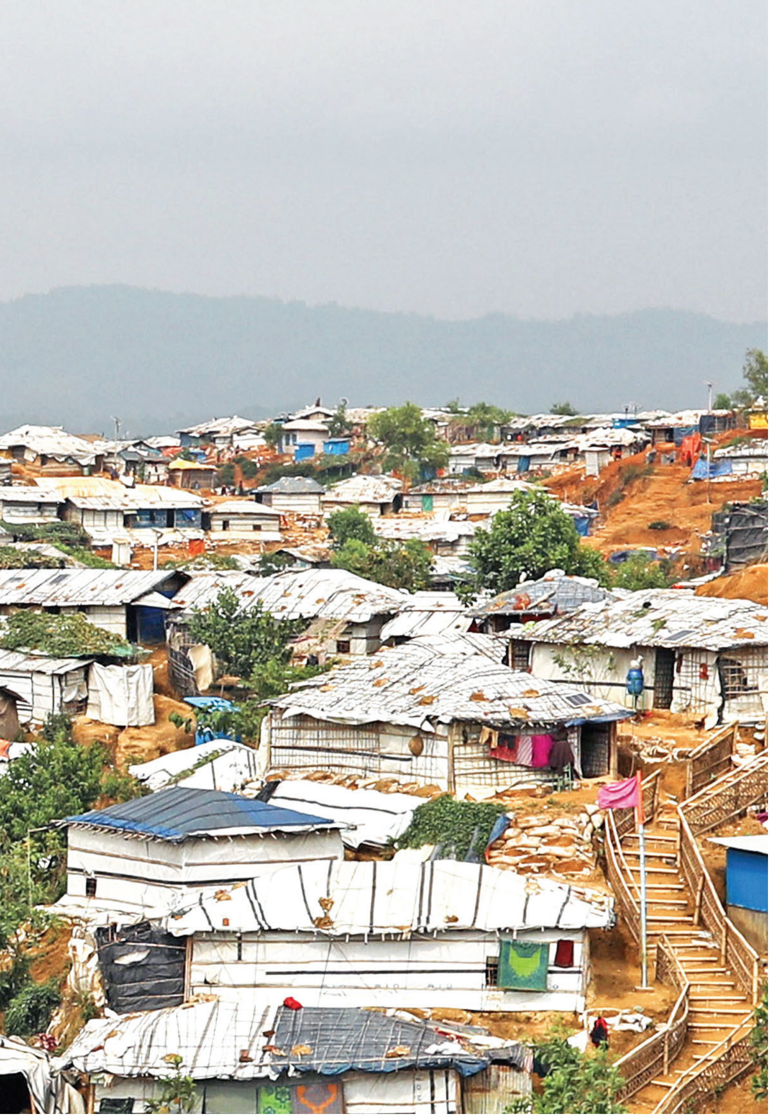

ভূমিকা পালন করতে হবে। কোনো একক দেশের পক্ষে একা রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ, আসিয়ান (ASEAN) সদস্যভুক্ত দেশসমূহ, তুরস্ক, মুসলিম বিশ্ব, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বৈশ্বিক শক্তিগুলোর মধ্যে একটি সুসংহত ও কার্যকর সমন্বয় এখন সময়ের দাবি।

তুরস্ক তার সরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তায় শুরু থেকেই পাশে রয়েছে। তুর্কি জনগণ রোহিঙ্গাদের প্রতি গভীর সংহতি অনুভব করে, কারণ তারা তাদের এই সংকটকে বিশ্বজুড়ে চলা অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক বৃহত্তর সংগ্রামের অংশ হিসেবে দেখে।

তবে এই সংহতিকে এখন একটি সুদূরপ্রসারী আন্তর্জাতিক কৌশলে রূপান্তরিত করতে হবে। আমাদের প্রয়োজন আরও কঠোর কূটনৈতিক পদক্ষেপ, বৈশ্বিক দায়বদ্ধতার সুষম বণ্টন, আশ্রয়দাতা দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য বর্ধিত সহযোগিতা এবং বিশ্বমঞ্চে রোহিঙ্গা সংকটকে ক্রমাগত দৃশ্যমান রাখা।

আজকের দিনে সবচেয়ে বড় বিপদ হলো–বাস্তুচ্যুতির এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিকে 'স্বাভাবিক' হিসেবে ধরে নেওয়ার প্রবণতা। একটি শরণার্থী সংকট যত দীর্ঘায়িত হয়, বিশ্ব ধীরে ধীরে সেটিকে একটি স্থায়ী বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে। অতীতে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংকটে আমরা এটি ঘটতে দেখেছি। শরণার্থী শিবিরগুলো একসময় আধা-স্থায়ী বসতিতে রূপ নেয়, জরুরি সহায়তা দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয় এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ অন্য কোথাও সরে যায়। আমাদের অবশ্যই এই বিপজ্জনক প্রবণতা প্রতিরোধ করতে হবে।

রোহিঙ্গারা যেন আন্তর্জাতিক অনাদর ও অবহেলার শিকার হয়ে আরেকটি 'বিস্মৃত জাতিতে' পরিণত না হয়। তাদের এই অন্তহীন কষ্ট আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় যে–যতক্ষণ না একটি পুরো জনগোষ্ঠীকে তাদের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

বাংলাদেশের এই মহান ভূমিকার দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, নৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কেবল অর্থনৈতিক পরাশক্তি হওয়ার প্রয়োজন হয় না। একইভাবে তুরস্কের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, মানবিক দায়বদ্ধতা কীভাবে একটি জাতির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। উভয় দেশই বিশ্বকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে–সহানুভূতি ও মানবতা কোনো দুর্বলতার লক্ষণ নয়, বরং তা সভ্যতার শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

ভবিষ্যতের স্থায়ী পথ খুঁজতে গিয়ে আমাদের মনে রাখা দরকার, যেকোনো স্থায়ী সমাধানের জন্য কেবল রাজনৈতিক চুক্তির চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক আস্থা, জবাবদিহিতা, সদিচ্ছা এবং মানব মর্যাদার প্রতি অবিচল অঙ্গীকার। শরণার্থীদের কোনো 'আর্থিক বা সামাজিক বোঝা' হিসেবে না দেখে, মানুষ হিসেবে দেখার মানসিকতা তৈরি করতে হবে–যাদের আশা, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। তারাও চায় নিরাপত্তা, পরিবার, শিক্ষা, জীবিকা এবং তাদের সন্তানদের একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ।

উপসংহার

আমাদের সামনে মূল প্রশ্ন এখন কেবল এটি নয় যে–প্রত্যাবাসন কি দূরবর্তী কোনো স্বপ্ন? বরং আসল প্রশ্ন হলো–আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সেই নৈতিক সাহস ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা আছে কি না, যা এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে।

বাংলাদেশ অসামান্য মানবিক নেতৃত্বের অনন্য নজির স্থাপন করেছে, তুরস্কও তার নিজস্ব সাধ্যমতো পাশে দাঁড়িয়েছে। যৌথ এই অভিজ্ঞতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কেবল অনুভূতি বা সহানুভূতি যথেষ্ট নয়; সহানুভূতির সাথে প্রয়োজন দৃঢ় অঙ্গীকার, আর সেই অঙ্গীকারকে রূপ দিতে হবে বাস্তব ন্যায়বিচারে। কেবল তখনই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কোনো দূরবর্তী কল্পনা হয়ে থাকবে না, বরং তা পরিণত হবে শান্তি, আত্মমর্যাদা ও আশার এক সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবমুখী পথে। ■

বিকল্প মাইক্রোফাইন্যান্স : সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেরণা

ড. শাহজাহান খান OAM
ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া। সাবেক উপাচার্য, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা; এবং প্রবাসী ফেলো, বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি।

মানবিকতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির অভূতপূর্ব অগ্রগতি সত্ত্বেও দারিদ্র্য আজও মানবজাতির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এমন এক সময়ে, যখন নজিরবিহীন পরিমাণ সম্পদ অল্পসংখ্যক ধনী ও বিলিয়নিয়ারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে—এমনকি বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ারেরও আবির্ভাব ঘটেছে—তখনও কোটি কোটি মানুষ খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং মানসম্মত আবাসনের মতো মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত।

এই বৈপরীত্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও মানবিকভাবে অপমানজনক। অত্যাধুনিক অস্ত্র উৎপাদন ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থ সহজেই বরাদ্দ করা হয়; কিন্তু দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানুষের কল্যাণে সেই তুলনায় অনেক কম সম্পদ ব্যবহৃত হয়।

গত কয়েক দশকে সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে বিপুল বিনিয়োগ করেছে। ক্ষুদ্রঋণ বা মাইক্রোফাইন্যান্সকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। তবুও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এখনও দারিদ্র্য, ঋণের বোঝা এবং অর্থনৈতিক অনিরাপত্তার মধ্যে জীবনযাপন করছে। তাই একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে–মাইক্রোফাইন্যান্স কি প্রধানত মুনাফাভিত্তিক থাকবে, নাকি সামাজিক দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে নতুনভাবে পুনর্গঠিত হবে?

প্রচলিত অনেক মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান দরিদ্র গ্রাহকদের থেকে ২০ শতাংশেরও বেশি হারে সুদ আদায় করে। কিন্তু ঐতিহ্যগত ফ্ল্যাট-রেট পদ্ধতিতে ঋণ পরিশোধের ফলে কার্যত ঋণগ্রহীতাদের বার্ষিক ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ বা তারও বেশি হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়। সীমিত আয়ের দরিদ্র পরিবারের জন্য এটি এক বিরাট আর্থিক বোঝা এবং অমানবিক ব্যবস্থা।

অপরদিকে, যদি ঋণগ্রহীতাদের কেবল মূলধনটি কিস্তিতে পরিশোধ করতে হতো এবং কোনো সুদ দিতে না হতো, তাহলে তাদের জন্য ঋণ পরিশোধ অনেক সহজ হতো। স্বাভাবিকভাবেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে–সুদমুক্ত ঋণব্যবস্থা কি সম্ভব? এটি কি টেকসই হতে পারে? মুনাফা না হলে অর্থায়ন করবে কে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ভর করে আমরা সম্পদ এবং মানবজীবনের সাফল্যকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করি তার ওপর।

মানুষ কেবল অর্থনৈতিক সত্তা নয়, যার একমাত্র লক্ষ্য আর্থিক মুনাফা সর্বাধিক করা। মানুষ একই সঙ্গে সমাজের সদস্য, যার সহমানুষের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। প্রকৃত সাফল্যের পরিমাপ শুধু কত সম্পদ অর্জন করা হয়েছে তা নয়; বরং সেই সম্পদ সমাজের কল্যাণে কতটা অবদান রেখেছে, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

দরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাদের মর্যাদা রক্ষা করা, তাদের অসহায়ত্ব থেকে মুনাফা অর্জন করা নয়। দরিদ্র হওয়ার কারণেই কেন একজন মানুষকে ধার নেওয়া অর্থের চেয়ে বেশি অর্থ ফেরত দিতে হবে? একটি প্রকৃত সমৃদ্ধ সমাজ হলো সেই সমাজ, যেখানে সম্পদ সীমিত কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়ে সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চালিত হয়।

মূল দার্শনিক প্রশ্নটি অত্যন্ত সহজ–আমাদের পরিবার, প্রতিবেশী এবং সমাজের মানুষ যদি কষ্টে থাকে, তাহলে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি কি প্রকৃত সুখ এনে দিতে পারে?

যে সমাজে সাফল্য কেবল অর্থের অঙ্কে পরিমাপ করা হয়, সেখানে সুদমুক্ত মাইক্রোফাইন্যান্স অবাস্তব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যেখানে মানুষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্বও স্বীকার করে, সেখানে এ ধরনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত।

বাংলাদেশকে আধুনিক মাইক্রোফাইন্যান্সের জন্মভূমি হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু অসংখ্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও এদেশের দারিদ্র্য নির্মূল করা এখনও সম্ভব হয়নি। এর অন্যতম কারণ হলো প্রচলিত মাইক্রোফাইন্যান্স মূলত এমন একটি ব্যবসায়িক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়, যেখানে বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে সর্বাধিক আর্থিক মুনাফা অর্জনই প্রধান লক্ষ্য। দারিদ্র্য বিমোচনকে উদ্দেশ্য হিসেবে তুলে ধরা হলেও, বাস্তবে মুনাফা অর্জনই পরিচালনাগত প্রধান চালিকাশক্তি।

ঐতিহ্যগত গ্রুপ-ভিত্তিক ঋণব্যবস্থা পারস্পরিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে ঋণ আদায়ের হার বাড়াতে সফল হয়েছে। কিন্তু এর মৌলিক আর্থিক কাঠামো এখনও দেশের সবচেয়ে অসহায় জনগোষ্ঠীর কাছ থেকেই সুদ আদায়ের ওপর নির্ভরশীল।

প্রচলিত অর্থনৈতিক চিন্তাধারার একটি বড় সীমাবদ্ধতা হলো মানুষকে শুধু অর্থনৈতিক সত্তা হিসেবে দেখা। অথচ মানুষ একই সঙ্গে সামাজিক সত্তা, যার সমাজের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষকে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের

ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার অন্যতম শক্তিশালী উপকরণ কারদে হাসান বা কল্যাণমূলক সুদমুক্ত ঋণ বাংলাদেশে আরও বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে।

শিক্ষা দেয়, কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলার ওপর তুলনামূলকভাবে খুব কম গুরুত্ব দেয়।

এর ফলে সমাজ ক্রমেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে এবং বিত্তবানদের মধ্যে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রেরণা কমে যায়। তাই অর্থনৈতিক কল্যাণের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করাও অপরিহার্য। অর্থনৈতিক সাফল্য পরিবারকে স্বাচ্ছন্দ্য দেয়, আর সামাজিক দায়িত্ব সমাজে সম্প্রীতি, মানবিক বন্ধন এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচার, সম্পদের ন্যায্য বণ্টন এবং মানবিক মর্যাদা রক্ষার মাধ্যমে এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো প্রদান করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সম্পদ তার চূড়ান্ত মালিকানা নয়; বরং আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) প্রদত্ত একটি আমানত, যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষের কাছে ন্যস্ত থাকে।

যাকাত, উশর, ওয়াক্ফ, কারদে হাসান (সুদমুক্ত ঋণ), সদকা এবং সুদমুক্ত নৈতিক ব্যবসা–এসব ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থা দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক সুরক্ষা এবং টেকসই সমাজ গঠনের কার্যকর উপায়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এগুলোকে প্রায়শই কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেখা হয়; অথচ এগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণের শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

ইতিহাস এ বিষয়ে অনুপ্রেরণাদায়ক উদাহরণ প্রদান করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এসব নীতি সামাজিক কল্যাণের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশেষ করে খলিফা উমর ইবন আবদুল আজিজ (রহ.)-এর শাসনামলে দারিদ্র্য এতটাই কমে গিয়েছিল যে, যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত মানুষ খুঁজে পাওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছিল বলে ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। যদিও বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ভিন্ন, তবুও এই অভিজ্ঞতা আজও ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে আছে।

ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার অন্যতম শক্তিশালী উপকরণ কারদে হাসান বা কল্যাণমূলক সুদমুক্ত ঋণ বাংলাদেশে আরও বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে।

এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান একটি তহবিলে অর্থ প্রদান করবে, যেখান থেকে দরিদ্র মানুষ সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করবে। ঋণগ্রহীতা কেবল মূলধন কিস্তিতে পরিশোধ করবে। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যয় দাতারা পৃথকভাবে বহন করবেন–সাধারণত মূল অনুদানের অতিরিক্ত প্রায় ৮ থেকে ১০ শতাংশ প্রদান করে–ফলে ঋণগ্রহীতাকে কোনো প্রশাসনিক ব্যয় বা সুদ পরিশোধ করতে হবে না।

বিকল্পভাবে, দাতারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরতযোগ্য তহবিলও প্রদান করতে পারেন এবং সেই সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যয় বহন করতে পারেন। ঋণ পরিশোধের পর মূলধন পুনরায় নতুন ঋণগ্রহীতাদের জন্য ব্যবহার করা যাবে, ফলে একটি টেকসই ঘূর্ণায়মান তহবিল (Revolving Fund) গড়ে উঠবে, যা ধারাবাহিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে কাজ করবে।

বাংলাদেশে ইতোমধ্যে সীমিত পরিসরে এ ধরনের উদ্যোগ রয়েছে। তবে জাতীয় পর্যায়ে কারদে হাসান বাস্তবায়নের জন্য এখনও একটি বিশ্বাসযোগ্য, স্বচ্ছ এবং পেশাদারভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি।

মদিনার আদর্শে অনুপ্রাণিত সামাজিক দায়বদ্ধতাভিত্তিক সুদমুক্ত মাইক্রোফাইন্যান্স প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক হতে পারে। এটি বিদ্যমান আর্থিক ব্যবস্থার বিকল্প নয়; বরং সহমর্মিতা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এবং মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি নতুন পথ।

বাংলাদেশের রয়েছে প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য, ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং সামাজিক ভিত্তি। এখন প্রয়োজন দূরদর্শী নেতৃত্ব, জনআস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সততা। এই তিনটি উপাদান একত্রিত করা গেলে, একটি সুসংগঠিত কারদে হাসান ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নত করতে পারে এবং প্রমাণ করতে পারে যে দারিদ্র্য বিমোচনের চালিকাশক্তি শুধু মুনাফা নয়–সামাজিক দায়বদ্ধতাও হতে পারে। ■

আদিনা মসজিদ বিতর্ক: ইতিহাসকে রাজনীতিকরণ?

মাসুমুর রহমান খলিলী

সিনিয়র সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক

পশ্চিমবঙ্গের মালদহের ঐতিহাসিক স্থাপনাকে ঘিরে নতুন বিতর্কের অবতারণা

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা আদিনা মসজিদ সাত শতকেরও বেশি সময় ধরে বাংলার ইতিহাস, স্থাপত্য ও রাজনৈতিক স্মৃতির এক অনন্য সাক্ষী। একসময় এটি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম জুমা মসজিদ। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এটি আর কেবল একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়; বরং ভারতের ইতিহাসচর্চা, ধর্মীয় পরিচয়, আদালত, নির্বাচন এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিতর্কের কেন্দ্রে তুলে আনা হয়েছে।

বিজেপি ও আরএসএস-ঘনিষ্ঠ কয়েকটি সংগঠন দাবি করছে, আদিনা মসজিদ একটি প্রাচীন 'আদিনাথ' মন্দিরের ওপর নির্মিত। অন্যদিকে অধিকাংশ মূলধারার ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক বলছেন, মসজিদে পূর্ববর্তী স্থাপনার উপাদান পুনর্ব্যবহার (spolia) হয়েছে বটে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণের দাবির পক্ষে এখনো চূড়ান্ত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ প্রকাশিত হয়নি। ফলে প্রশ্নটি শুধু অতীতের নয়; এটি বর্তমান ভারতের রাজনীতিরও।

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত আদিনা মসজিদকে ঘিরে নতুন করে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তা কেবল একটি ধর্মীয় স্থাপনা নিয়ে নয়; এটি ইতিহাসের ব্যাখ্যা, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ, জাতীয় পরিচয়, সাংস্কৃতিক স্মৃতি এবং সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতির সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা একটি প্রশ্ন। একদিকে বিজেপি ও আরএসএস-ঘনিষ্ঠ সংগঠনগুলোর দাবি-মসজিদটি একটি প্রাচীন 'আদিনাথ' মন্দিরের স্থানে নির্মিত; অন্যদিকে অধিকাংশ মূলধারার ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক বলছেন, এমন দাবির পক্ষে এখনো নির্দিষ্ট ও সর্বজনস্বীকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। ফলে বিষয়টি নিয়ে যে কোনো আলোচনা করতে হলে প্রথমেই ফিরে যেতে হবে মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসে।

পাণ্ডুয়া: বাংলার এক বিস্মৃত রাজধানী

আজকের মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া একসময় বাংলার রাজধানী ছিল। গৌড়ের পাশাপাশি পাণ্ডুয়া মধ্যযুগীয় বাংলার প্রশাসনিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়। এখানেই নির্মিত হয় আদিনা মসজিদ, একলাখি সমাধি, কুতুবশাহী মসজিদসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা।

১৩শ ও ১৪শ শতকে বাংলা ধীরে ধীরে দিল্লি সালতানাতের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই স্বাধীনতার স্থাপত্যিক ঘোষণাপত্রগুলোর মধ্যে আদিনা মসজিদ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

১৩৪২ সালে শাসমুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার বিভিন্ন অংশকে একীভূত করে স্বাধীন সুলতানি শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহী বংশই প্রথম সমগ্র বাংলাকে একটি রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসে।

ইতিহাসবিদ আর সি মজুমদার তাঁর History of Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইলিয়াস শাহের আমল থেকেই বাংলা কার্যত দিল্লির অধীনতা থেকে মুক্ত একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ইলিয়াস শাহের উত্তরসূরি সিকান্দর শাহ এই রাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী করেন। তাঁর সময়েই নির্মিত হয় আদিনা মসজিদ।

সিকান্দার শাহ: কেন নির্মাণ করলেন আদিনা মসজিদ?

সুলতান সিকান্দার শাহের শাসনামলে বাংলা অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় দিক থেকেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সঙ্গে সংঘর্ষে বাংলা নিজের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এই প্রেক্ষাপটে একটি বিশাল জামে মসজিদ নির্মাণ ছিল কেবল ধর্মীয় প্রয়োজন নয়; এটি ছিল সাম্রাজ্যিক শক্তি ও স্বাধীনতার প্রকাশ।

পার্সি ব্রাউন লিখেছেন যে, আদিনা মসজিদ ছিল 'এমন একটি স্থাপনা, যা শাসকের রাজনৈতিক মর্যাদা ও ক্ষমতার ভাষা বহন করে।'

বেশিরভাগ গবেষকের মতে, আদিনা মসজিদ ১৩৭৩ থেকে ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়। মসজিদের পারসিয়ান শিলালিপিতে সুলতান সিকান্দার শাহের উপাধি এবং তাঁর শাসনের গৌরব বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তাঁকে আল্লাহর অনুগ্রহে বিজয়ী শাসক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

শিলালিপিতে এমন কোনো উল্লেখ নেই যে এখানে একটি নির্দিষ্ট 'আদিনাথ মন্দির' ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। তবে শিলালিপির নীরবতা নিজেই কোনো কিছুর চূড়ান্ত প্রমাণ নয়; ইতিহাসে অনেক ঘটনাই শিলালিপিতে উল্লেখ থাকে না। আবার কেবল পরবর্তী যুগের মৌখিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতেও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। তাই ইতিহাসবিদরা শিলালিপিকে অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিখিত সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করেন।

আদিনার গুরুত্ব ও বিতর্ক

আদিনা মসজিদের পরিকল্পনা মধ্যপ্রাচ্যের বৃহৎ জামে মসজিদগুলোর আদলে হলেও এতে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যরীতি স্পষ্ট। বিশাল খোলা অঙ্গন, বহু খিলান, সারিবদ্ধ স্তম্ভ এবং কেন্দ্রীয় নাভ (nave)-এর বিন্যাস এটিকে অনন্য করে তোলে।

George Michell-এর মতে, এটি দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামী স্থাপত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। Percy Brown একে মধ্যযুগীয় ভারতের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী স্থাপত্য প্রকল্পগুলোর একটি হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন।

আদিনা মসজিদের বহু স্তম্ভ, কারুকাজ ও পাথরের অংশে হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পরীতির ছাপ রয়েছে। এই বিষয়টি নতুন আবিষ্কার নয়। ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই প্রত্নতাত্ত্বিকরা এটি নথিভুক্ত করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো–এর অর্থ কী? এখানেই ব্যাখ্যার মতভেদ।

প্রথম ব্যাখ্যা: কিছু গবেষক ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠন মনে

আদিনা মসজিদ শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু গত কয়েক বছরে এটি নতুন বিতর্কের কেন্দ্রে এসেছে। বিজেপি ও আরএসএস-ঘনিষ্ঠ কয়েকটি সংগঠন দাবি করছে, এটি মূলত একটি 'আদিনাথ' মন্দিরের ওপর নির্মিত। অন্যদিকে অধিকাংশ মূলধারার ইতিহাসবিদ মনে করেন, এই দাবিকে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ এখনো নেই।

করে, এসব উপাদান একটি বা একাধিক মন্দির ভেঙে এনে ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের মতে, এটি শুধু নির্মাণসামগ্রী পুনর্ব্যবহার নয়; বরং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আধিপত্যের প্রকাশ।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা: অন্যদিকে Richard M. Eaton-এর মতো ইতিহাসবিদ দেখিয়েছেন, মধ্যযুগে পূর্ববর্তী ভগ্ন স্থাপনা থেকে পাথর এনে নতুন ভবনে ব্যবহার করা ছিল ভারতসহ বিশ্বের বহু অঞ্চলে প্রচলিত একটি নির্মাণপ্রথা। তাই পুনর্ব্যবহৃত পাথর দেখেই কোনো নির্দিষ্ট মন্দির ধ্বংসের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।

বিতর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'আদিনা' নামটি নিয়ে।

একটি মত অনুযায়ী, এটি 'আদিনাথ' শব্দ থেকে এসেছে এবং সেই সূত্রেই এখানে জৈন বা শৈব মন্দির ছিল।

অন্যদিকে ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় এ বিষয়ে কোনো সর্বজনস্বীকৃত ঐকমত্য নেই। অনেক গবেষক মনে করেন, 'আদিনা' নামের উৎপত্তি নিয়ে একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে এবং কোনো একটিকে চূড়ান্ত বলা যায় না।

আদিনা মসজিদকে ঘিরে বর্তমান বিতর্ক বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে—ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ প্রায়ই সমকালীন রাজনীতিতে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অযোধ্যা, কাশী বা মথুরার মতো আদিনাও এখন এমন এক স্থানে পরিণত হয়েছে, যেখানে প্রত্নতত্ত্ব, ধর্ম, আইন এবং নির্বাচনী রাজনীতি পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

তবে ইতিহাসচর্চার মৌলিক নীতি হলো-দাবি ও প্রমাণকে আলাদা রাখা। কোনো রাজনৈতিক দাবি তখনই ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়, যখন তা দলিল, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও সমালোচনামূলক গবেষণার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

আদিনা মসজিদ: ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও রাজনীতি

আদিনা মসজিদ শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু গত কয়েক বছরে এটি নতুন বিতর্কের কেন্দ্রে এসেছে। বিজেপি ও আরএসএস-ঘনিষ্ঠ কয়েকটি সংগঠন

দাবি করছে, এটি মূলত একটি 'আদিনাথ' মন্দিরের ওপর নির্মিত। অন্যদিকে অধিকাংশ মূলধারার ইতিহাসবিদ মনে করেন, এই দাবিকে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ এখনো নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে–এই বিতর্কের সূত্রপাত কোথায়? ইতিহাসের দলিল কী বলে? প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা কী বলছে? আর রাজনীতি কেন এই স্থাপনাকে নতুন করে আলোচনায় আনছে?

আদিনা মসজিদ নির্মিত হয় ১৪শ শতকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সমসাময়িক পারসিয়ান ইতিহাস, শিলালিপি কিংবা সুলতানি আমলের দলিলে কোথাও 'আদিনাথ মন্দির' ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণের সরাসরি উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ইতিহাসবিদরা সাধারণত তিন ধরনের উৎস ব্যবহার করেন–সমসাময়িক শিলালিপি; সমসাময়িক বা কাছাকাছি সময়ের লিখিত ইতিহাস; প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ।

এই তিনটির কোনোটিই এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে 'আদিনাথ মন্দির ধ্বংস' তত্ত্বকে প্রমাণ করেনি।

প্রশ্ন হলো তাহলে এই ধারণা এলো কীভাবে? ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিকরা আদিনা মসজিদের ভেতরে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মোটিফ লক্ষ্য করেন। বিশেষ করে–পদ্মফুল, ঘণ্টা, লতাপাতা, অলঙ্কৃত স্তম্ভ ও ভাঙা ভাস্কর্যের অংশ। এসব দেখে ধারণা জন্মায় যে এগুলো পূর্ববর্তী কোনো স্থাপনা থেকে আনা হয়েছে।

কিন্তু 'পূর্ববর্তী স্থাপনা' আর 'নির্দিষ্ট আদিনাথ মন্দির'–এই দুই দাবির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।

Alexander Cunningham ভারতের প্রত্নতত্ত্বের পথিকৃৎ। তিনি আদিনা মসজিদ পরিদর্শন করে উল্লেখ করেন–মসজিদে ব্যবহৃত বহু স্তম্ভ ও পাথর পূর্ববর্তী হিন্দু স্থাপনা থেকে এসেছে বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি কোথাও নিশ্চিতভাবে লেখেননি–'এখানে আদিনাথ মন্দির ছিল।' এটি পরবর্তী সময়ের ব্যাখ্যা।

স্থাপত্য ইতিহাসবিদ Percy Brown বলেন–আদিনা মসজিদে পুনর্ব্যবহৃত উপাদান রয়েছে। কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণের মূল বিষয় ছিল–স্থাপত্য; নির্মাণরীতি; সাম্রাজ্যিক নকশা। তিনি মন্দির ধ্বংসের রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় যাননি।

George Michell দেখিয়েছেন–বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে স্থানীয় শিল্পরীতির ব্যবহার ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। অনেক সময় স্থানীয় কারিগররাই মুসলিম স্থাপনা নির্মাণ করতেন। ফলে হিন্দু মোটিফ, অলঙ্করণ, ফুল-লতা–এসব উপস্থিত থাকা অস্বাভাবিক নয়।

এই বিতর্কে সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত গবেষক সম্ভবত Richard M. Eaton। তিনি দেখিয়েছেন–ভারতে মুসলিম শাসনের সময় মন্দির ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু সব মন্দির ধ্বংস ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিদ্রোহ দমন, ক্ষমতার প্রতীক ভাঙা, অর্থনৈতিক লুণ্ঠন–এসবও কারণ ছিল।

তিনি সতর্ক করে বলেন–'প্রতিটি ঘটনাকে আলাদা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করতে হবে।' অর্থাৎ আদিনা নিয়ে সাধারণীকরণ করা ঠিক হবে না।

ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ R. C. Majumdar মুসলিম শাসনের সমালোচনা করেছেন বহু ক্ষেত্রে। কিন্তু আদিনা মসজিদকে নির্দিষ্ট 'আদিনাথ মন্দির ধ্বংস' হিসেবে তিনি উপস্থাপন করেননি।

জদুনাথ সরকারও বাংলার মুসলিম শাসন নিয়ে বিস্তর লিখেছেন। কিন্তু আদিনা নিয়ে তিনি কোনো নিশ্চিত মন্দির ধ্বংস তত্ত্ব দেননি।

আরেকটি প্রশ্ন হলো–তাহলে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ কী? এখানে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক খননে নিম্নলিখিত বিষয় নিশ্চিত হয়নি–নির্দিষ্ট মন্দিরের ভিত্তি, শিলালিপি, দেবমূর্তি, পূজামণ্ডপ, গর্ভগৃহ যা সরাসরি 'আদিনাথ মন্দির' হিসেবে শনাক্ত করা যায়।

ইতিহাসবিদরা এটিকে 'unproven hypothesis' অর্থাৎ অপ্রমাণিত অনুমান বলেন।

ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ (ASI) আদিনা মসজিদকে ১৪শ শতকের সংরক্ষিত ইসলামী স্থাপত্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। এখন পর্যন্ত এএসআইয়ের কোনো সরকারি প্রতিবেদনে 'আদিনাথ মন্দির' শব্দ ব্যবহার করেনি।

সাম্প্রতিক সময়ে কিছু আবেদনকারী আদালতের কাছে বৈজ্ঞানিক জরিপ Ground Penetrating Radar (GPR) এবং খননের আবেদন করেছেন।

তাদের যুক্তি–বৈজ্ঞানিক তদন্ত হলে প্রকৃত ইতিহাস বেরিয়ে আসবে। অন্যদিকে বিরোধী পক্ষের বক্তব্য–প্রতিটি ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভে এমন দাবি তুললে সংরক্ষিত ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বিজেপি ও আরএসএস কেন এ বিতর্ক তুলছে?

এখানে ইতিহাসের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা প্রয়োজন। আরএসএসের আদর্শে ভারতের ইতিহাসকে 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ'-এর আলোকে পুনর্ব্যাখ্যার প্রবণতা রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অতীতের বহু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থাপনা জাতীয় পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিজেপির সমর্থকেরা যুক্তি দেন, ইতিহাসে উপেক্ষিত বা বিতর্কিত অধ্যায়গুলো পুনরায় অনুসন্ধান করা উচিত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সত্য সামনে আসা প্রয়োজন।

অন্যদিকে সমালোচকদের মতে, এ ধরনের ইস্যু নির্বাচনের আগে ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক রাজনৈতিক মেরুকরণকে তীব্র করতে পারে এবং অর্থনীতি, কর্মসংস্থান বা শাসনসংক্রান্ত প্রশ্ন থেকে জনআলোচনার কেন্দ্র সরিয়ে নিতে পারে।

এই দুই অবস্থানের মধ্যে কোনটি কতটা প্রযোজ্য–তা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের বিষয়; ইতিহাস নিজে এর চূড়ান্ত

> উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিকরা আদিনা মসজিদের ভেতরে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মোটিফ লক্ষ্য করেন। বিশেষ করে–পদ্মফুল, ঘণ্টা, লতাপাতা, অলঙ্কৃত স্তম্ভ ও ভাঙা ভাস্কর্যের অংশ। এসব দেখে ধারণা জন্মায় যে এগুলো পূর্ববর্তী কোনো স্থাপনা থেকে আনা হয়েছে।

উত্তর দেয় না।

আদিনা মসজিদ বিতর্ক আমাদের একটি মৌলিক শিক্ষা দেয়–ইতিহাস কখনো স্লোগানে লেখা যায় না। প্রমাণ, প্রত্নতত্ত্ব, শিলালিপি, সমসাময়িক দলিল, স্থাপত্য বিশ্লেষণ–সবকিছু মিলিয়েই ইতিহাস গড়ে ওঠে।

আজ পর্যন্ত যা নিশ্চিত–আদিনা মসজিদে পুনর্ব্যবহৃত স্থাপত্য উপাদান রয়েছে; এটি স্বাধীন বাংলা সুলতানির সাম্রাজ্যিক স্থাপত্য। এর মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্পরীতির উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে।

যা এখনো নিশ্চিত নয়–এটি একটি নির্দিষ্ট 'আদিনাথ মন্দির' ধ্বংস করে নির্মিত–এ দাবির পক্ষে সর্বজনস্বীকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক ঐকমত্য নেই।

আদিনা বিতর্ক ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গের মালদহের পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত আদিনা মসজিদ আজ কেবল একটি মধ্যযুগীয় স্থাপত্য নয়; এটি ইতিহাসের ব্যাখ্যা, ধর্মীয় স্মৃতি, আইনি কাঠামো এবং আধুনিক রাজনৈতিক পরিচয়ের বিতর্কের অংশ হয়ে উঠেছে। ১৪শ শতকে সুলতান সিকান্দার শাহের আমলে নির্মিত এই স্থাপনাটি একসময় ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হতো এবং বর্তমানে এটি একটি সংরক্ষিত ঐতিহাসিক স্মারক।

গত কয়েক বছরে 'আদিনাথ মন্দিরের ওপর আদিনা মসজিদ নির্মাণ'-এমন দাবি ঘিরে আলোচনা তীব্র হয়েছে। ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় উত্তরে বলা হয়েছে, এএসআই এ ধরনের দাবির বিষয়ে কোনো পৃথক পরীক্ষা বা সমর্থনকারী/খণ্ডনকারী সরকারি প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। ফলে বিতর্কটি বর্তমানে মূলত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, রাজনৈতিক দাবি এবং আইনি সম্ভাবনার ক্ষেত্রেই অবস্থান করছে।

ভারতের রাজনীতিতে ইতিহাসের স্মৃতিস্তম্ভগুলো বহুবার পরিচয়-রাজনীতির প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আদিনা মসজিদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে কয়েকটি বড় প্রশ্ন প্রাধান্য পেয়েছে–ধর্মীয় পরিচয়, সংখ্যালঘু ভোট, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ বনাম বৃহত্তর ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়। আদিনা বিতর্ক এই বৃহত্তর রাজনৈতিক আলোচনার একটি অংশ।

বিজেপি ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর একটি অংশ মনে করে, ভারতের ইতিহাসে যেসব ধর্মীয় স্থাপনা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, সেগুলো পুনরায় গবেষণা করা উচিত। তাদের বক্তব্যের মূল ভিত্তি হলো–ঐতিহাসিক সত্য অনুসন্ধান কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়; এটি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের বিষয়।

সমালোচকদের মতে, মধ্যযুগীয় স্থাপনা নিয়ে বিতর্ক রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়াতে পারে এবং অতীতের সংঘাতকে বর্তমান সামাজিক সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

ইতিহাসবিদদের একটি বড় অংশের সতর্কতা হলো–অতীতের ঘটনাকে বর্তমানের রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সরলীকরণ করলে ইতিহাসের জটিলতা হারিয়ে যায়।

অযোধ্যা, কাশী, মথুরা ও আদিনা : কেন তুলনা হয়?

ভারতে ধর্মীয় স্থাপনা নিয়ে বিতর্কের আলোচনায় প্রায়ই অযোধ্যা, কাশী, মথুরার পাশাপাশি আদিনার নাম উঠে আসে। তবে ইতিহাসবিদদের মতে, প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষাপট আলাদা।

অযোধ্যার রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিরোধ ছিল দীর্ঘ

আইনি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিষয়। ২০১৯ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে রায় দেয়।

কাশী বিশ্বনাথ-জ্ঞানবাপী এবং মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমি-শাহী ঈদগাহ বিরোধগুলো পৃথক আইনি ও ঐতিহাসিক প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত।

আদিনার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত মূল প্রশ্ন হলো–কোনো নির্দিষ্ট পূর্ববর্তী ধর্মীয় স্থাপনার অস্তিত্ব ছিল কি? থাকলে তার সঙ্গে বর্তমান স্থাপনার সম্পর্ক কী? প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ কতটা নির্ভরযোগ্য?

অর্থাৎ এটি এখনো মূলত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পর্যায়ে রয়েছে।

ভারতের ধর্মীয় স্থাপনা সংক্রান্ত বিতর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলোর একটি হলো Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991।

এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো–১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কোনো ধর্মীয় স্থানের যে চরিত্র ছিল, তা বজায় রাখা এবং ধর্মীয় স্থানের রূপান্তর ঠেকানো।

আইনটির মূল যুক্তি ছিল–স্বাধীনতার পর ধর্মীয় স্থাপনা নিয়ে নতুন বিরোধ সীমিত করা, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কমানো ও ঐতিহাসিক বিরোধের পরিবর্তে ভবিষ্যতের শান্তি নিশ্চিত করা। তবে এই আইন নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।

এর সমর্থকদের মতে–শত শত বছরের পুরনো বিরোধ পুনরায় খুললে সামাজিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রকে বর্তমান বাস্তবতা রক্ষা করতে হবে।

সমালোচকদের মতে–যদি কোনো ঐতিহাসিক অন্যায় ঘটে থাকে, তাহলে বিচারিক প্রতিকার বন্ধ করা উচিত নয়। এই বিতর্ক ভারতের সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ঐতিহাসিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা : ধর্মীয় স্থাপনা ও ঐতিহাসিক স্মৃতি

আদিনা বিতর্ককে বোঝার জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাও গুরুত্বপূর্ণ।

কর্ডোবার মসজিদ-ক্যাথেড্রাল, স্পেন : কর্ডোবার মহান মসজিদ অ্যান্ডালুসিয়ার ইসলামী সভ্যতার প্রতীক ছিল। খ্রিস্টান পুনর্দখলের পর এটি ক্যাথেড্রালে রূপান্তরিত হয়। আজ এটি স্পেনের সবচেয়ে আলোচিত ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোর একটি।

জেরুজালেম : জেরুজালেমের পবিত্র স্থানগুলো দেখায়, ইতিহাস, ধর্ম ও রাজনীতি একসঙ্গে যুক্ত হলে একটি স্থাপনা কতটা সংবেদনশীল প্রতীকে পরিণত হতে পারে।

আদিনা মসজিদ ভৌগোলিকভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত হলেও এটি বৃহত্তর ঐতিহাসিক বাংলার অংশ। মধ্যযুগে বাংলা একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চল ছিল। গৌড়, পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও, ঢাকা–সবই একই ঐতিহাসিক ধারার অংশ।

বাংলাদেশের ইতিহাসবিদদের কাছেও আদিনা মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি–বাংলা সুলতানি স্থাপত্যের নিদর্শন; মধ্যযুগীয় বাংলার রাজনৈতিক শক্তির প্রতীক ও বাংলার বহুস্তরীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অংশ। তাই এ ধরনের বিতর্ক দুই বাংলার সাংস্কৃতিক আলোচনাতেও প্রভাব ফেলতে পারে।

আদিনা বিতর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো–ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসের পদ্ধতিতেই খুঁজতে হবে। প্রয়োজন–প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, শিলালিপি বিশ্লেষণ, স্থাপত্য গবেষণা, সমসাময়িক দলিল ও একাডেমিক পর্যালোচনা। কোনো দাবিকে কেবল রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে সত্য বা মিথ্যা বলা ইতিহাসচর্চার পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আদিনা মসজিদ-সংঘাতের প্রতীক করা হবে?

আদিনা মসজিদ নিয়ে বিতর্ক আসলে একটি বড় প্রশ্ন সামনে আনে–একটি সমাজ তার অতীতকে কীভাবে স্মরণ করবে? একটি পথ হলো অতীতের সংঘাতকে বর্তমানের পরিচয় রাজনীতির অংশ করা। অন্য পথ হলো অতীতকে গবেষণার বিষয় হিসেবে দেখা–যেখানে সত্য অনুসন্ধান, প্রমাণ ও সহাবস্থানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আদিনা মসজিদের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত ইতিহাস হলো–এটি ১৪শ শতকের বাংলা সুলতানি স্থাপত্য; এটি সুলতান সিকান্দার শাহের নির্মিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্মারক; এতে পূর্ববর্তী স্থাপত্য উপাদানের ব্যবহার রয়েছে; 'আদিনাথ মন্দির ধ্বংস করে নির্মাণ' দাবিটি এখনো বিতর্কিত এবং সরকারি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠিত নয়।

ভবিষ্যতে এই বিতর্কের সমাধান রাজনৈতিক স্লোগানে নয়, বরং ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও আইনের সুশৃঙ্খল প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত। ■

তথ্যসূত্র

Richard M. Eaton — The Rise of Islam and the Bengal Frontier

Richard M. Eaton — Temple Desecration and Muslim States in Medieval India

Percy Brown — Indian Architecture (Islamic Period)

George Michell — Architecture of the Islamic World

Catherine B. Asher — Architecture of Mughal India

R. C. Majumdar — History of Bengal

Archaeological Survey of India — Protected Monument Records

Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 (Wikipedia)

রোহিঙ্গা: ভূগোলের অভিশাপ ও নিয়তির পরিহাস

(গত ৫ জুলাই ঢাকায় সেন্টার ফর সিভিলিজেশনাল ডায়ালগ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি ট্রাস্ট) যৌথভাবে আয়োজিত 'ন্যাভিগেটিং দ্য রোহিঙ্গা ক্রাইসিস : হ্যাজ রিটার্ন বিকাম অ্যান আনরিচেবল ড্রিম?' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার ভিত্তিতে রচিত।)

ইসাম শেহাদাত
সিনিয়র এডিটর, ডেইলি সাবাহ, ইস্তাম্বুল

রোহিঙ্গাদের এই মানবিক ট্র্যাজেডি আমাদের সময়ের অন্যতম ভয়াবহ বিপর্যয়। বহু অর্থেই এটি ফিলিস্তিনি জনগণের দীর্ঘদিনের আত্মত্যাগের প্রতিধ্বনি এবং বছরের পর বছর ধরে সিরীয়দের সহ্য করা নির্মম যন্ত্রণার এক বাস্তব স্মারক।

একজন সিরীয় হিসেবে আমি নিজে অবিচার, যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি এবং নির্বাসনের নির্মম অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছি। বাশার আল-আসাদের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা সিরিয়ার প্রায় অর্ধেক জনগণকে নিজের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করেছিল। দেশের ভেতরে ও সীমান্তে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। এই অবিশ্বাস্য পরিসংখ্যানের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে লাখ লাখ ছন্নছাড়া জীবন, ছিন্নভিন্ন পরিবার এবং চরম অনিশ্চয়তায় ঝুলে থাকা একটি পুরো প্রজন্মের ভবিষ্যৎ।

লাখ লাখ সিরীয় বছরের পর বছর তাঁবুতে কাটিয়েছে; অনেকেই ভেবে নিয়েছিল তারা হয়তো আর কখনোই প্রিয় মাতৃভূমির মুখ দেখতে পাবে না। তৎকালীন আসাদ সরকারের এক জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তার হুমকি আজও আমার কানে বাজে–যিনি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, তারা যদি ফিরেও আসে, তবে এমন কিছুই পাবে না যা তাদের বেঁচে থাকতে উৎসাহিত করবে।

সিরীয়রা যখন নিজেদের এই ভয়াবহ ট্র্যাজেডি সহ্য করছিল, তখন আমরা দূর থেকে রোহিঙ্গাদের করুণ ভাগ্য পর্যবেক্ষণ করতাম। তাদের যন্ত্রণার অবসানের জন্য আমরা প্রার্থনা করতাম এবং তাদের কষ্টের মাঝে নিজেদের ব্যথার ছায়া

দেখতে পেতাম। তবুও একটি অপ্রিয় সত্যকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না: রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি ছিল আমাদের চেয়েও বেশি হতাশাজনক ও নির্মম।

ভূগোলের অভিশাপ

আমি প্রায়শই 'ভূগোলের অভিশাপ' ধারণাটি নিয়ে চিন্তা করি। সিরিয়া তার ভূরাজনৈতিক অবস্থানের জন্য চড়া মূল্য দিয়েছে; অবরোধ, বোমাবর্ষণ, ক্ষুধা আর ধ্বংসযজ্ঞ সহ্য করেছে। কিন্তু সেই একই ভূগোল সিরীয়দের পালানোর একটি পথ অন্তত খুলে দিয়েছিল। তারা প্রতিবেশী দেশ–জর্ডান, লেবানন ও তুরস্কে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। পরবর্তীতে সেখান থেকে অনেকে ইউরোপের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। পথিমধ্যে ভূমধ্যসাগরের নোনা জলে হাজারো স্বপ্ন তলিয়ে গেলেও, অনেকেই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও না কোথাও নতুন করে জীবন পুনর্গঠন করতে পেরেছে।

কিন্তু রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে ভূগোল কোনো বিকল্প বা মানবিক পথ খোলা রাখেনি। মিয়ানমারের আরাকান (রাখাইন) রাজ্যটি মূলত মিয়ানমার ও বাংলাদেশের সীমানায় বন্দি। তাই মিয়ানমার সেনাবাহিনীর পরিকল্পিত জাতিগত নিধন ও গণহত্যা থেকে বাঁচতে রোহিঙ্গাদের সামনে একটিমাত্র গন্তব্যই খোলা ছিল–'বাংলাদেশ'।

নিজের অজস্র অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যার চাপ সত্ত্বেও বাংলাদেশ উদার চিত্তে তাদের জন্য সীমান্ত খুলে দিয়েছিল। ইতিহাস নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের এই অনন্য মানবিকতাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে–ঠিক যেভাবে সিরীয় শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ানো দেশগুলোর অবদানকে ইতিহাস মনে রেখেছে।

তবে এই দুই ট্র্যাজেডির মাঝে একটি বিরাট মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে।

আসাদ সরকারের পতনের পর সিরীয়রা আজ ধীরে ধীরে নিজ ঘরে ফেরার আলো দেখতে পাচ্ছে। তাদের প্রত্যাবাসনে এখনো বহু জটিলতা থাকলেও, এটি অন্তত একটি বাস্তব সম্ভাবনায় রূপ নিয়েছে। অথচ রোহিঙ্গাদের জন্য সেই সম্ভাবনা আজও এক দূরবর্তী অন্ধকারেই বন্দি। আর এই মৌলিক পার্থক্যটিই বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে জমে থাকা গভীর হতাশাকে পুঞ্জীভূত করে তুলছে।

বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারের মেয়াদে রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনায় একটি পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক মঞ্চে রোহিঙ্গাদের পক্ষে সরব ভূমিকা রাখলেও, শিবিরগুলোর দৈনন্দিন পরিচালনায় ধীরে ধীরে কঠোর নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সময়ের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক তহবিল হ্রাস পাওয়া এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই নীতি ক্রমশ শক্ত রূপ নেয়–যা সিরীয় শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া বেশ কয়েকটি দেশেও দেখা গিয়েছিল।

ঢাকায় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন একটি ভারসাম্যপূর্ণ, মানবিক এবং মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নতুন নীতি নির্ধারণের আশা জাগিয়েছে। রোহিঙ্গাদের কেবল 'অর্থনৈতিক বোঝা' বা 'নিরাপত্তা ঝুঁকি' হিসেবে দেখলে সংকটের আসল গোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। তারা শরণার্থী হওয়ার আগে একটি পরিকল্পিত বর্ণবাদী ও নিপীড়নমূলক রাজনীতির শিকার হয়েছিল–যা তাদের নাগরিকত্ব, মৌলিক অধিকার এবং সবশেষে জন্মভূমি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেছে।

তবে কোনো বিভ্রান্তির অবকাশ নেই: রোহিঙ্গাদের মূল ভবিষ্যৎ কিন্তু বাংলাদেশে নির্ধারিত হবে না। এই সংকটের প্রকৃত চাবিকাঠি ঢাকায় নয়, নেপিদোতে নিহিত।

প্রত্যাবাসন কি দূরবর্তী আশা?

ঢাকার গোলটেবিল আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই প্রশ্নটি: রোহিঙ্গাদের নিজ ভূমে প্রত্যাবর্তন কি এখনো কোনো বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা, নাকি এটি শুধুই এক অধরা স্বপ্ন?

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ রোহিঙ্গা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো—কোন শর্তে এবং কীভাবে এই প্রত্যাবর্তন সম্ভব? সীমান্ত পার হয়ে ওপারে গেলেই তো আর বছরের পর বছর ধরে চলা নির্বাসনের যাতনা শেষ হয় না। প্রত্যাবর্তন তখনই অর্থবহ ও স্থায়ী হয়, যখন তার সাথে থাকে সুনির্দিষ্ট গ্যারান্টি: পূর্ণ নাগরিকত্বের স্বীকৃতি, আইনি সুরক্ষা, কেড়ে নেওয়া জমি ও ভিটেমাটি ফেরত পাওয়া, রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে স্থায়ী নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি মানবিক মর্যাদার পুনর্বহাল। অথচ আজ মিয়ানমারে এর একটি শর্তও বিদ্যমান নেই।

রোহিঙ্গারা এখনো তাদের কেড়ে নেওয়া নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত। রাখাইন রাজ্য এখনো চরম অস্থিতিশীল। সেখানে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বেশ কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠীও সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যাদের বিরুদ্ধেও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে একটি নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের কল্পনা করা বাস্তবতার চেয়ে একটি আকাশকুসুম আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

আলোচনায় এই উদ্বেগের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। কিছু বিশেষজ্ঞ জোর দিয়েছেন যে, এখনই প্রত্যাবাসনের উপযোগী পরিবেশ তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে। আবার অনেকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, শিবিরে স্থবির হয়ে থাকা লাখ লাখ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও জীবনযাত্রার মতো তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলোকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

দায়িত্বের সুষম বণ্টন

সিরীয় শরণার্থী সংকটের ভার ভাগ করে নিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশ—তুরস্ক, লেবানন, জর্ডান এবং ইরাক। প্রতিটি দেশই তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্বেগের কথা তুলে ধরেছিল।

কিন্তু রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলাদেশ প্রায় একাই এই বিশাল মানবিক সংকটের পুরো বোঝা বহন করছে। আর এখানেই সমস্যাটি আরো জটিল হয়ে উঠেছে। কোনো একক উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে সাহায্য ছাড়া বছরের পর বছর ধরে এমন বিপুল জনসংখ্যার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বোঝা বহন করা একেবারেই অসম্ভব।

কেবলমাত্র ত্রাণের চাল-ডাল দিয়ে এই সংকটের সমাধান হবে না। মানবিক সহায়তা জরুরি, কিন্তু তা কখনোই আন্তর্জাতিক মহলের একটি সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর রাজনৈতিক কৌশলের বিকল্প হতে পারে না।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাদের নৈতিক দায়িত্ব ঘাড়ে নিতেই হবে। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের ওপর কঠোর কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। একই সাথে জাতিসংঘ, আসিয়ান (ASEAN), ওআইসি (OIC) এবং বিশ্ব পরাশক্তিগুলোর মধ্যে একটি সুসংহত সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে।

আজকের বিশ্ব একের পর এক নতুন যুদ্ধ, রাজনৈতিক সংঘাত ও মানবিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে—যা বৈশ্বিক মনোযোগকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। নতুন সংকটের ভিড়ে পুরানো ট্র্যাজেডিগুলো ধীরে ধীরে ধামাচাপা পড়ার ঝুঁকিতে পড়ে। আজ রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে ঠিক এই বিপদটিই সবচেয়ে দৃশ্যমান।

কিন্তু কিছু বেদনা এমন থাকে, যা সময় পার হলেও কমে না; সময় কেবল সেগুলোকে চোখের আড়াল করে দেয়। ইতিহাস আমাদের শেখায়—একটি সংকটকে ভুলে যাওয়া মানেই তার সমাধান হয়ে যাওয়া নয়।

এটি নীরবে ভেতরের ক্ষতকে আরো বিষাক্ত করে তোলে, যতক্ষণ না তা একদিন আরো ভয়াবহ রূপ নিয়ে বিশ্বমঞ্চে আছড়ে পড়ে।

রোহিঙ্গা সংকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তা মিলিয়ে যাবে না; বরং এতে এমন একটি নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর নির্বাসনের মেয়াদই কেবল দীর্ঘায়িত হবে—যাঁরা বহু বছর ধরে নিজেদের ভিটেমাটি, নাগরিক অধিকার এবং নিজ ঘরে ফেরার আকুল আশা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন। ■

জাতিসংঘ সনদ, কাশ্মীর ও পক্ষপাতমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সংকট

গোলাম নবী ফাই, পিএইচডি
চেয়ারম্যান, ওয়ার্ল্ড ফোরাম ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস, নিউ ইয়র্ক

"এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব গাজা, ইউক্রেন, সুদানসহ বিভিন্ন অঞ্চলের রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও যুদ্ধে কেঁপে উঠছে, তখন নিরাপত্তা পরিষদের এই বিতর্ক কেবল একটি কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতা ছিল না–বরং তা বিশ্ব ব্যবস্থার অভ্যন্তরে জমে থাকা আরও গভীর এক গভীর সংকটকে উন্মোচিত করেছে।"

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'জাতিসংঘ সনদের লক্ষ্য ও নীতিসমূহ সমুন্নত রাখা এবং জাতিসংঘ-কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা' শীর্ষক উন্মুক্ত আলোচনাটি নিছক কোনো প্রথাগত কূটনৈতিক চর্চা ছিল না।

বিদেশি দখলদারিত্বের যাঁতাকলে পিষ্ট, অমীমাংসিত সংঘাতের মুখোমুখি এবং বহু দশক ধরে বিশ্বমঞ্চে প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিচারের অপেক্ষায় থাকা কোটি কোটি মানুষের জন্য এই বিতর্কটি ছিল এক বিরল মুহূর্ত–যেখানে ছিল এক ধরণের সতর্ক আশার সঞ্চার। তাদের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের ২ কোটি ৩০ লাখ মানুষও রয়েছেন, যারা নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মূল অভিভাবক হিসেবে আজও আশার চোখ নিয়ে জাতিসংঘের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব গাজা, ইউক্রেন, সুদানসহ বিভিন্ন প্রান্তের রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও যুদ্ধে কেঁপে উঠছে, তখন নিরাপত্তা পরিষদের এই বিতর্ক বিশ্ব ব্যবস্থার ভেতরে লুকিয়ে থাকা আরও গভীর এক সংকটকে স্পষ্ট করে তুলেছে: আর তা হলো–জাতিসংঘ সনদের মহৎ নীতিসমূহ এবং বাস্তবে সেই নীতিগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরাশক্তির দ্বৈত বা অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ব্যবধান।

লাটভিয়ার রাষ্ট্রদূত সানিতা পাভ্লুটা-দেসল্যান্ডেস পরিষদকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'জাতিসংঘ সনদ যেন আমাদের রক্ষা করতে পারে, সেজন্য সনদকে রক্ষা করা আমাদের সবার যৌথ দায়িত্ব।' একইভাবে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ভাসিলি নেবেনজিয়া এই সনদকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার 'মূল ভিত্তিপ্রস্তর' হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এর প্রতি ক্রমবর্ধমান অবহেলার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।

এই বক্তব্যগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এগুলো আধুনিক ভূরাজনীতিতে প্রায়শই ভুলে যাওয়া একটি চিরন্তন সত্যকে সামনে নিয়ে এসেছে: জাতিসংঘ সনদ কেবল পরাশক্তিগুলোর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়নি। আন্তর্জাতিক আইনের সমপ্রয়োগের মাধ্যমে ছোট-বড়, সব রাষ্ট্রকেই সুরক্ষা দেওয়াই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর মোহাম্মদ ইসহাক দার যথার্থভাবেই জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই সনদ বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করে এবং যেকোনো ভূখণ্ডের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়।

তিনি পরিষদের সামনে পুনর্ব্যক্ত করেন যে, এই নীতিগুলো পাকিস্তানের জন্য 'পবিত্র' এবং বৈশ্বিক কূটনীতিতে দেশটির অবস্থানের প্রধান ভিত্তি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের অমীমাংসিত বিরোধের দিকে বৈশ্বিক মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন–যা কাশ্মীরি জনগণকে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া একাধিক প্রস্তাব সত্ত্বেও প্রায় আট দশক ধরে নিরাপত্তা পরিষদের এজেন্ডায় বন্দি হয়ে রয়েছে।

তার যুক্তি কেবল কাশ্মীরের ভৌগোলিক সীমানায় আটকে ছিল না; বরং তিনি এমন এক তিতা বাস্তবতার কথা তুলে ধরেছেন যা বৈশ্বিক দক্ষিণের (Global South) একটি বড় অংশ তীব্রভাবে অনুভব করছে। তা হলো: যখন একটি সংঘাতে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা হয় কিন্তু অন্য সংঘাতে তা সুবিধাজনকভাবে উপেক্ষা করা হয়, তখন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতাই ক্ষুণ্ন হয়। যখন দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে কেবল বেছে বেছে নিন্দা জানানো হয়, তখন ন্যায়বিচার তার স্বকীয় অর্থ হারায়। আর যখন নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবগুলো কিছু নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে কার্যকর করা হয় কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে সেগুলো অলংকারের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়, তখন দুর্বল রাষ্ট্রগুলো প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হয়–আন্তর্জাতিক আইন সত্যিই সবার জন্য সমান কি না।

ভণ্ডামির পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত হরিশ পারভাথানেনিও স্বীকার করেছেন যে, জাতিসংঘের বৈধতা ও কার্যকারিতা নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে। তিনি 'দ্বৈত নীতি' বা দ্বিমুখী আচরণের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলেন এবং জোর দেন যে, ক্ষমতার রাজনীতি বা শক্তি প্রদর্শন করে বহুপাক্ষিকতাবাদকে জোরদার করা যায় না।

তার এই কথাগুলো মুহূর্তের জন্য আশা জাগিয়েছিল যে ভারত হয়তো অবশেষে জাতিসংঘ সনদ সম্পর্কিত তাদের বক্তৃতাগুলোকে কাশ্মীরের মূল বাস্তবতার সাথে মেলাবে। কারণ জম্মু ও কাশ্মীর নিরাপত্তা পরিষদের সামনে থাকা সবচেয়ে পুরনো বিরোধগুলোর একটি এবং এর জনগণ আজও সেই জাতিসংঘেরই গৃহীত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের অপেক্ষায় ক্ষণ গুনছে। তবে সেই আশা ম্লান হতে সময় লাগেনি।

কাশ্মীর সংকট বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মৌলিক নীতি নিয়ে গঠনমূলক আলোচনার বদলে, ভারতীয় প্রতিনিধি সীমান্ত-সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ এবং পাকিস্তানের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈরিতার পুরনো অভিযোগের বৃত্তেই আটকে রইলেন। এই কৌশলগত পরিবর্তনটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ–যা আবারও প্রমাণ করেছে কীভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাশ্মীর সম্পর্কিত আলোচনাকে মূল ইস্যু অর্থাৎ স্বয়ং কাশ্মীরি জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ও তাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

জর্জ বার্নার্ড শ একবার বলেছিলেন, 'পরিবর্তন ছাড়া অগ্রগতি অসম্ভব; আর যারা নিজেদের মন পরিবর্তন করতে পারে না, তারা আদতে কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না।' এই পর্যবেক্ষণটি আজ দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতির জন্য বেদনাকাতরভাবে সত্য।

কাউন্সিলর সাইমা সলিমের মাধ্যমে উপস্থাপিত পাকিস্তানের পাল্টা জবাবের লক্ষ্য ছিল আলোচনার দৃষ্টি পুনরায় কাশ্মীরের মাঠপর্যায়ের নির্মম বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনা। তিনি যুক্তি দেন, ভারত কোনোভাবেই এই বিরোধের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইনি মর্যাদাকে অস্বীকার বা গোপন করতে পারে

জাতিসংঘ যদি সত্যিই তার সনদের প্রতি বিশ্ববাসীর হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনতে চায় এবং আন্তর্জাতিক আইনের সর্বজনীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে তাদের নিজেদেরই গৃহীত প্রস্তাবগুলোর এই 'বেছে বেছে বাস্তবায়নের' নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ন্যায়বিচার, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির মতো নীতিগুলো কখনোই সুবিধাবাদী রাজনীতির বন্দি হতে পারে না।

না। তিনি অধিকৃত অঞ্চলে বেসামরিক মানুষের অমানবিক দুর্ভোগ, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা দমন, নির্বিচারে আটক এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার হরণের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একই সাথে তিনি জাতিসংঘ সনদ ও নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে পাকিস্তানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

তবে এই কূটনৈতিক বাকযুদ্ধের ডামাডোলে একটি মৌলিক ও ঐতিহাসিক সত্য প্রায়শই হারিয়ে যায়: তা হলো–এই ভূরাজনৈতিক লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় মূল্য মেটাতে হচ্ছে নিরীহ কাশ্মীরি জনগণকে।

একটি আফ্রিকান প্রবাদে চমৎকারভাবে বলা হয়েছে, 'দুই হাতির যুদ্ধ হলে মূলত ক্ষতি হয় মাঠের ঘাসের।' কাশ্মীরের ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চয়তা, সীমাহীন সামরিকায়ন, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, চাপিয়ে দেওয়া নীরবতা এবং সহিংসতার অশেষ চক্রের মধ্যেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে। ভারত ও পাকিস্তান হয়তো আরও কয়েক দশক ধরে তাদের এই কূটনৈতিক বাকযুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে; কিন্তু এই দীর্ঘসূত্রতার মাশুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ কাশ্মীরি পুরুষ, নারী ও শিশুকে। আর এখানেই জাতিসংঘের ভূমিকা এখনো অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস যথার্থই বলেছেন, 'এই সনদ আজ অবধি শান্তির জন্য মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আশা। কিন্তু এর শক্তি নির্ভর করে তা বজায় রাখার দায়িত্বে থাকা পক্ষগুলোর অঙ্গীকার কতটা দৃশ্যমান, তার ওপর।' তিনি নিরাপত্তা পরিষদকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, বিশ্ব আজ 'শুধুমাত্র ফাঁকা বুলি নয়, কাজের প্রমাণ দেখতে চায়।'

কাশ্মীরের প্রেক্ষাপটে এই কথাগুলো গভীরভাবে প্রতিধ্বনিত হওয়া উচিত।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্যকে এটি অনুধাবন করতেই হবে যে–কাশ্মীর সমস্যাকে অনিশ্চয়তার গর্ভে ঠেলে রেখে স্থিতিশীলতা আনা সম্ভব নয়। এটি কেবল দুটি পারমাণবিক অস্ত্রধারী প্রতিবেশীর মধ্যে স্থায়ী যুদ্ধের উত্তেজনা টিকিয়ে রাখবে এবং কোটি কোটি মানুষের অবর্ণনীয় দুর্ভোগকে দীর্ঘায়িত করবে।

কোনো সামরিক পদক্ষেপ বা রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে এই সমস্যার টেকসই সমাধান আসবে না। এর জন্য প্রয়োজন সাহসী কূটনীতি, নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের–ভারত, পাকিস্তান এবং সর্বপরি কাশ্মীরি জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃত্বের–সমন্বয়ে ত্রিপাক্ষিক অর্থবহ সংলাপ।

ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে যে, শক্তিশালী তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী আঞ্চলিক সংঘাতগুলোর কদাচিৎ মীমাংসা হয়। উত্তর আয়ারল্যান্ড থেকে শুরু করে পূর্ব তিমুর–যেখানে দ্বিপাক্ষিক কূটনীতি ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানেই আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ ও ধারাবাহিক মধ্যস্থতা শান্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। কাশ্মীর সংকটও ঠিক একই ধরণের বৈশ্বিক মনোযোগ ও উদ্যোগ পাওয়ার দাবি রাখে।

জাতিসংঘ যদি সত্যিই তার সনদের প্রতি বিশ্ববাসীর হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনতে চায় এবং আন্তর্জাতিক আইনের সর্বজনীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে তাদের নিজেদেরই গৃহীত প্রস্তাবগুলোর এই 'বেছে বেছে বাস্তবায়নের' নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ন্যায়বিচার, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির মতো নীতিগুলো কখনোই সুবিধাবাদী রাজনীতির বন্দি হতে পারে না।

নিরাপত্তা পরিষদের এই সাম্প্রতিক বিতর্কটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বিশ্বনেতারা আজও জাতিসংঘ সনদের আদর্শিক জায়গা থেকে ভাষণ দিতে পছন্দ করেন। কিন্তু আসল পরীক্ষা নিউ ইয়র্কের সুশীতল সভাকক্ষে দেওয়া সুবক্তৃতায় নয়; বরং আন্তর্জাতিক শান্তি ও মানবতাকে সংকটে ফেলা এসব অমীমাংসিত সংঘাতের ক্ষেত্রে সেই নীতিগুলো সমানভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না–তার ওপরই নির্ভর করছে এর ভবিষ্যৎ। কাশ্মীর সেই ঐতিহাসিক পরীক্ষারই এক অন্যতম প্রতীক–আর পুরো বিশ্ব আজ সেটি পর্যবেক্ষণ করছে। ■

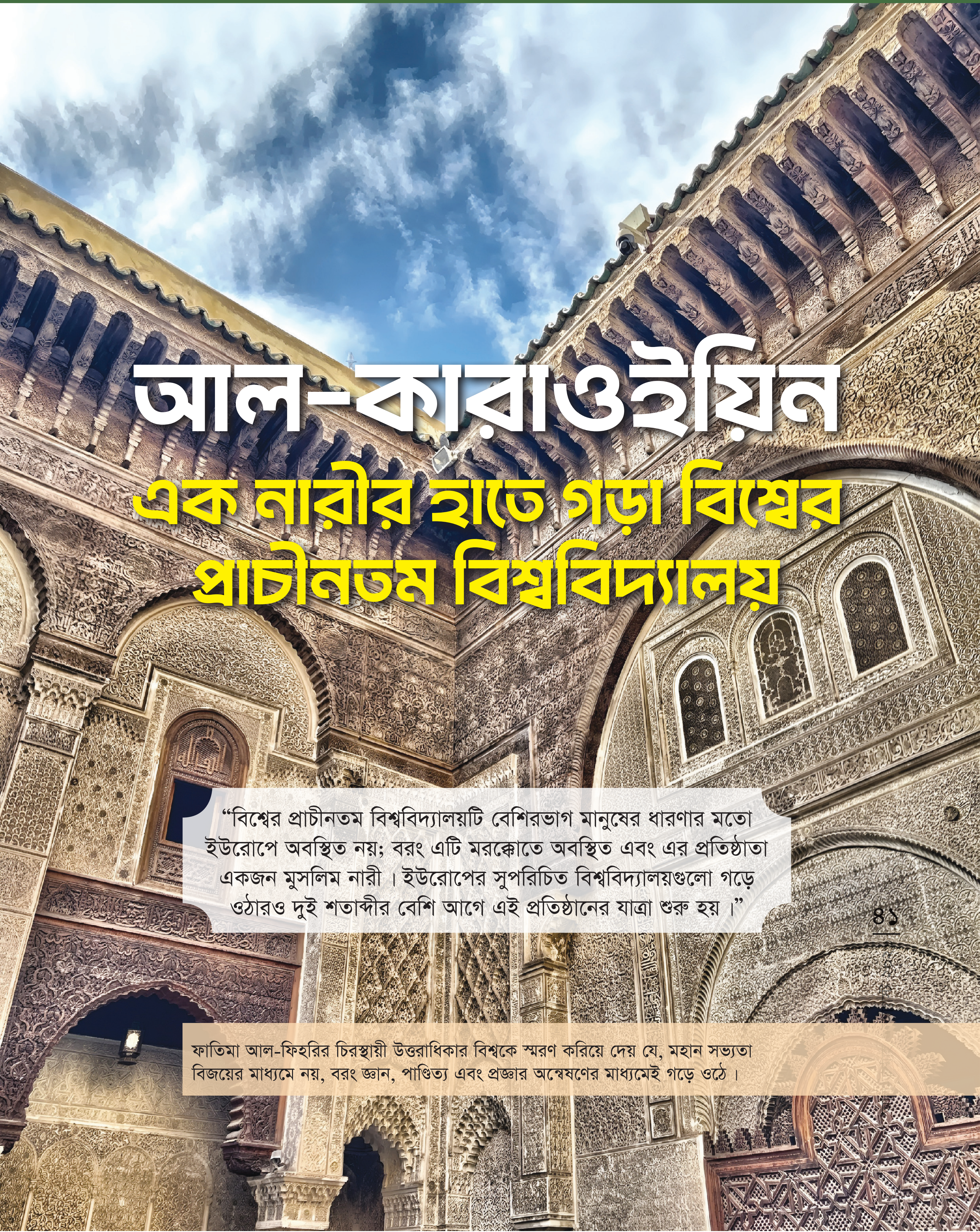

আল-কারাওইয়িন

এক নারীর হাতে গড়া বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়

"বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশিরভাগ মানুষের ধারণার মতো ইউরোপে অবস্থিত নয়; বরং এটি মরক্কোতে অবস্থিত এবং এর প্রতিষ্ঠাতা একজন মুসলিম নারী। ইউরোপের সুপরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়ে ওঠারও দুই শতাব্দীর বেশি আগে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।"

ফাতিমা আল-ফিহরির চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মহান সভ্যতা বিজয়ের মাধ্যমে নয়, বরং জ্ঞান, পাণ্ডিত্য এবং প্রজ্ঞার অন্বেষণের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে।

“ফাতিমা আল-ফিহরির চিন্তাভাবনা ও প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী সময়ে ইউরোপের শিক্ষাভাবনাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর সুসংগঠিত শিক্ষাকাঠামো পরবর্তীতে ইউরোপজুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়, যার ধারাবাহিকতায় বোলোনিয়া ও অক্সফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়।”

বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথা ভাবলেই আমাদের মানসপটে সম্ভবত অক্সফোর্ড কিংবা বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ভেসে ওঠে। তবে ইউনেস্কো (UNESCO) এবং গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্বীকৃতি অনুযায়ী, মরক্কোর আল-কারাওইয়িন (বা আল-কারাউইন) বিশ্ববিদ্যালয়ই হলো বিশ্বের বুকে আজও নিরবচ্ছিন্নভাবে সচল থাকা সবচেয়ে পুরোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণকারী মহীয়সী নারী ফাতিমা আল-ফিহরি মরক্কোর ঐতিহাসিক ফেজ শহরে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি কেবল পৃথিবীর দীর্ঘতম ধারাবাহিক সচল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়, বরং একজন নারীর–তা-ও আবার একজন মুসলিম নারীর হাতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।

ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বাবার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিশাল সম্পদ মানবকল্যাণে উৎসর্গ করে ফাতিমা এই বিদ্যাপীঠ নির্মাণ করেন। শুরুতে এটি একটি মসজিদ এবং সংলগ্ন মাদ্রাসা হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও, কালক্রমে তা পূর্ণাঙ্গ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। এই প্রতিষ্ঠানই বিশ্বে প্রথম শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ওপর ভিত্তি করে প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি প্রদানের রীতি চালু করে। প্রথমদিকে মূল নজর ধর্মীয় শিক্ষায় থাকলেও, দ্রুতই এর পাঠ্যসূচিতে যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার মতো মৌলিক বিজ্ঞানসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়।

শিক্ষার মান ও নানামুখী বিষয়ের চর্চার কারণে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীরা এখানে ছুটে আসতেন। এর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা এতটাই বিস্তার লাভ করে যে, কর্তৃপক্ষ কঠোর ভর্তি পরীক্ষা চালু করতে বাধ্য হয়। ভর্তি হতে হলে শিক্ষার্থীদের পবিত্র কুরআন মুখস্থ রাখার পাশাপাশি আরবি ভাষা ও বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক ছিল।

তৎকালীন শাসকরা অনুদান, উপহার এবং বিরল বই ও পাণ্ডুলিপি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রসারে বড় ভূমিকা রাখেন। ফলে আল-কারাওইয়িন চত্বরে একাধিক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে, যেখানে সংরক্ষিত হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের কালজয়ী সব সৃষ্টি। এই ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারটি আজও গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত, যেখানে কাঠ খোদাই করে তৈরি ফাতিমা আল-ফিহরির মূল ডিপ্লোমা (সনদপত্র) সংরক্ষিত রয়েছে।

বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের ৪,০০০-এরও বেশি মূল্যবান ও দুর্লভ পাণ্ডুলিপি রয়েছে। যার মধ্যে পবিত্র কুরআনের প্রাচীন অনুলিপির পাশাপাশি রয়েছে সমাজবিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদুনের ১৪ শতকের মহাকাব্যিক রচনা 'আল-মুকাদ্দিমা' ও 'আল-ইবার'-এর মূল কপি।

এছাড়া এতে সংরক্ষিত রয়েছে ইমাম মালিক সংকলিত হাদিসের প্রাচীনতম আকরগ্রন্থ 'আল-মুয়াত্তা', যাকে ইসলামী আইনশাস্ত্রের (ফিকহ) অন্যতম প্রাথমিক ও প্রামাণ্য ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মতোই আল-কারাওইয়িন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মিত তর্ক-বিতর্ক, গবেষণা ও সেমিনারের আয়োজন করত–যা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। ফাতিমা আল-ফিহরির দর্শনই ছিল এমন এক মুক্ত সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ তৈরি করা, যা প্রগতিশীল শিক্ষাদান ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত রাখবে।

ফাতিমা আল-ফিহরির এই প্রদূরদর্শী চিন্তা ইউরোপের উদীয়মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আল-কারাওইয়িনের যুগান্তকারী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকাঠামো ইউরোপের জ্ঞানচর্চায় নতুন উদ্দীপনা জোগায়। ইউরোপীয় মনীষীরা এই পদ্ধতির অপার সম্ভাবনা অনুধাবন করে নিজেদের দেশে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ হন। এর প্রত্যক্ষ ফসল হিসেবে ১০৮৮ সালে ইতালির বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১০৯৬ সালে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়।

ইতিহাসজুড়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বখ্যাত অনেক মনীষীর চারণভূমি ছিল। ১২ শতকের বিখ্যাত মানচিত্রকার মোহাম্মাদ আল-ইদ্রিসি এখানেই পড়াশোনা করেন, যাঁর নির্মিত মানচিত্র রেনেসাঁ যুগের ইউরোপীয় সমুদ্রাভিযান ও ভৌগোলিক আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি অন্য ধর্মের পণ্ডিতদের জন্যও উন্মুক্ত ছিল। খ্রিস্টান পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার (৯৪৬-১০০৩), যিনি গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার টানে এখানে অধ্যয়ন করতে এসেছিলেন।

যদিও দীর্ঘ ঐতিহ্যের পর ১৯৬৩ সালে আল-কারাওইয়িনকে মরক্কোর আধুনিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৬৫ সালে এর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে 'ইউনিভার্সিটি অব আল-কারাওইয়িন' করা হয়। প্রচলিত ভুল ধারণার বিপরীতে, শুরু থেকেই নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই এখানে অধ্যয়নের সুযোগ ছিল। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় পশ্চিমা ধাঁচের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জনপ্রিয়তা বাড়ায় এখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা কিছুটা কমলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আজকের আধুনিক যুগেও বিশ্ববিদ্যালয়টি তার শতবর্ষী শিক্ষাদান পদ্ধতি টিকিয়ে রেখেছে; যেখানে শিক্ষার্থীরা এখনও 'হলকা' (halqa) নামক ঐতিহ্যবাহী অর্ধবৃত্তাকার ধারায় শিক্ষকের চারপাশে গোল হয়ে বসে পরম নিষ্ঠায় জ্ঞান অর্জন করে। ■

১০ বছর পর:

ব্যর্থ অভ্যুত্থান চেষ্টা যেভাবে নতুন তুরস্ক গঠন করেছে

আল-উম্মাহ ডেস্ক
ইস্তাম্বুল

২০১৬ সালের ১৫ জুলাইয়ের ব্যর্থ অভ্যুত্থান চেষ্টার এক দশক পর, তুরস্ক আজও সেই অন্ধকার রাতটিকে নিজ ইতিহাসের অন্যতম প্রধান 'টার্নিং পয়েন্ট' বা যুগান্তকারী মুহূর্ত হিসেবে বিবেচনা করে।

ফেতুল্লাহ টেররিস্ট অর্গানাইজেশন (FETO)-এর সদস্যদের দ্বারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার একটি সশস্ত্র প্রচেষ্টা হিসেবে যা শুরু হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক, সামরিক ও নিরাপত্তা অঙ্গনকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয়; একই সাথে শক্তিশালী করে তোলে গণতান্ত্রিক বৈধতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি জনগণের প্রতিশ্রুতিকে।

২০১৬ সালের ১৬ই জুলাই রাতে রেসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে তুরস্কের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল।

২০১৬ সালের ১৫ জুলাই সন্ধ্যায়, তুর্কি সশস্ত্র বাহিনীতে অনুপ্রবেশকারী FETO-সংশ্লিষ্ট সদস্যরা আঙ্কারা ও ইস্তাম্বুলের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে লক্ষ্য করে একটি সমন্বিত অভ্যুত্থানচেষ্টা শুরু করে। সামরিক ইউনিটগুলো বসফরাস সেতু ও ফাতিহ সুলতান মেহমেত সেতুসহ কৌশলগত অবস্থানগুলো দখল করে নেয়। অন্যদিকে, যুদ্ধের বিমান ও সামরিক হেলিকপ্টারগুলো শহর দুটির ওপর দিয়ে নিচু উচ্চতায় উড়তে থাকে।

অভ্যুত্থানকারীরা তুর্কি রেডিও ও টেলিভিশন কর্পোরেশন (TRT)-এর সদর দফতরেও হানা দেয় এবং এক সংবাদ উপস্থাপককে জোরপূর্বক একটি বিবৃতি পাঠে বাধ্য করে। ওই বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয় যে, সামরিক বাহিনী দেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। একই সময়ে, প্রধান সড়কগুলোতে ট্যাংক মোতায়েন করা হয় এবং রাজধানীর বেশ কয়েকটি অংশে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।

রাত বাড়ার সাথে সাথে, অভ্যুত্থানটি তুর্কি রাষ্ট্রের ওপর এক অভূতপূর্ব আক্রমণে রূপ নেয়। তুরস্কের গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি (সংসদ ভবন) যখন বোমাবর্ষণের শিকার হয়, তখন আইনপ্রণেতারা ভবনের ভেতরেই অবস্থান করছিলেন। এছাড়া প্রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, পুলিশ সদর দফতর, গোয়েন্দা সংস্থা এবং অন্যান্য কৌশলগত প্রতিষ্ঠানগুলোতে হামলা চালানো হয়, যা ১৯২৩ সালে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থার ওপর অন্যতম সহিংস আক্রমণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

অভ্যুত্থান শুরুর সময় প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগান এজিয়ান সাগরের উপকূলে ছুটিতে ছিলেন। তিনি একটি তুর্কি টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি 'ফেসটাইম' (FaceTime) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যুক্ত হন। নাগরিকদের রাস্তাঘাট, বিমানবন্দর ও পাবলিক স্কোয়ারগুলোতে নেমে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি দেশবাসীকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা রক্ষা করার তাগিদ দেন।

লাখ লাখ মানুষ এই আহ্বানে সাড়া দেয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নাগরিকরা ট্যাংকের মুখোমুখি দাঁড়ায়, সামরিক কনভয় আটকে দেয় এবং বিমানবন্দর, সেতু ও সরকারি ভবনগুলোতে জড়ো হতে থাকে। পুলিশ বাহিনী ও অভ্যুত্থান প্রতিরোধকারী সামরিক কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকরা ষড়যন্ত্রকারীদের লক্ষ্য অর্জনে বাধা দিতে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করে।

১৬ জুলাই সকালের মধ্যেই সরকারি বাহিনী দেশের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করে। অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রাতে জিম্মি হওয়া শীর্ষ সামরিক কমান্ডারদের উদ্ধার করা হয়।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অভ্যুত্থান প্রতিরোধের সময় প্রায় ২৫০ জন নিহত এবং ২,০০০-এরও বেশি মানুষ আহত হন। তুরস্কতে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের '১৫ জুলাইয়ের শহীদ' হিসেবে স্মরণ করা হয়; যাদের এই আত্মত্যাগ দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষার ক্ষেত্রে জাতির দৃঢ় সংকল্পের প্রতীক।

তুরস্ক সরকার শুরু থেকেই দাবি করে আসছে যে, এই অভ্যুত্থানচেষ্টার মূল পরিকল্পনাকারী ছিল ফেতুল্লাহ গুলেনের নেতৃত্বাধীন FETO, যারা কয়েক দশক ধরে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরে একটি ব্যাপক গোপন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, সংগঠনটি সুপরিকল্পিতভাবে সামরিক বাহিনী, বিচার বিভাগ, পুলিশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারের অন্যান্য শাখায় অনুপ্রবেশ করেছিল, যাকে তুর্কি কর্তৃপক্ষ একটি 'সমান্তরাল রাষ্ট্রীয় কাঠামো' (Parallel State Structure) হিসেবে বর্ণনা করে থাকে।

ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর, তুরস্ক আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু করে। দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়, যার ফলে কর্তৃপক্ষ FETO-এর সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে এবং এর সদস্যদের সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বরখাস্ত করতে সক্ষম হয়।

একটি ব্যর্থ বিদ্রোহের পরিকল্পনাকারীদের প্রতিহত করতে আঙ্কারার রাস্তায় সমর্থকদের ঢল নামে।

চলানো হয় দেশব্যাপী ব্যাপক বিচার বিভাগীয় ও নিরাপত্তা অভিযান। এই সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে হাজার হাজার সামরিক কর্মকর্তা, বিচারক, আইনজীবী, পুলিশ কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষাবিদকে আটক, অভিযুক্ত কিংবা বরখাস্ত করা হয়। তুর্কি কর্তৃপক্ষের যুক্তি ছিল যে, এই সংগঠনের প্রভাব নির্মূল করতে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ হুমকি প্রতিরোধ করতে এই কঠোর ব্যবস্থাগুলো অপরিহার্য ছিল।

এই পুনর্গঠন কেবল নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সশস্ত্র বাহিনীর ওপর বেসামরিক নজরদারি জোরদার করা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাষ্ট্রের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নানা সংস্কার কার্যকর করা হয়। কর্মকর্তারা এই সংস্কারগুলোকে এমন শক্তিশালী ও স্থিতিস্থাপক সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের সাংবিধানিক অবক্ষয় রোধে সক্ষম।

ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরবর্তী বছরগুলো তুরস্কের রাজনৈতিক ভূদৃশ্যে এক নতুন যুগের সূচনা করে। ২০১৭ সালের এপ্রিলে দেশটিতে একটি সাংবিধানিক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, যা সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তরের অনুমোদন দেয়। ২০১৮ সালের রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় নির্বাচনের পর এই নতুন ব্যবস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়, যা রাষ্ট্রপতিকে ব্যাপক নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করে।

তুরস্ক সরকারের মতে, এই সাংবিধানিক পরিবর্তনগুলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করেছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে দ্রুত করেছে এবং অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জগুলোতে কার্যকর সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করেছে। কর্মকর্তাদের দাবি, এই সংস্কারগুলো একটি কার্যকর শাসন ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যা জটিল নিরাপত্তা পরিবেশের চাহিদা পূরণে সক্ষম।

তুর্কি সামরিক বাহিনীও ব্যাপক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে গেছে। সামরিক বাহিনীর ওপর বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করা হয়েছে, কমান্ড কাঠামো পুনর্গঠিত হয়েছে এবং সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর জন্য নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তুর্কি কর্তৃপক্ষের দাবি, এই পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে কোনো গোপন সংগঠনের অনুপ্রবেশের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

একই সাথে, তুরস্ক তার অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা শিল্পে বিনিয়োগের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়; কারণ ১৫ জুলাইয়ের ঘটনা থেকে পাওয়া প্রধান শিক্ষাগুলোর একটি ছিল কৌশলগত আত্মনির্ভরশীলতা। গত এক দশকে দেশটি ড্রোন (চালকবিহীন আকাশযান), প্রিসিশন-গাইডেড মিউনিশন (নির্ভুল নিশানা ক্ষমতাসম্পন্ন গোলাবারুদ), নৌযান, সাঁজোয়া যান, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধ প্রযুক্তির উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

আজ তুরস্কের প্রতিরক্ষা খাতকে দেশের অন্যতম প্রধান কৌশলগত অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশীয়ভাবে উৎপাদিত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি এখন দেশের নিরাপত্তা নীতির মূল স্তম্ভে পরিণত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বাজারে তুরস্কের অবস্থান সুদৃঢ় করতে অবদান রাখছে।

একটি ব্যর্থ বিদ্রোহের হোতাদের প্রতিহত করতে আঙ্কারার রাস্তায় রাত্রিকালীন এক বিশাল সমাবেশে সমর্থকদের ঢল নামে।

ব্যর্থ অভ্যুত্থান থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা তুরস্কের বৃহত্তর জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলকেও পুনর্নির্মাণ করেছে। গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় উন্নত হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক হুমকি থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার ওপর সর্বোচ্চ জোর দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তারা আজও FETO-এর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকাকে জাতীয় নিরাপত্তার শীর্ষ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করেন।

ব্যর্থ অভ্যুত্থানচেষ্টার দশম বার্ষিকীতে, প্রতি বছরের মতো এবারও '১৫ জুলাই গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্য দিবস' উদযাপনের অংশ হিসেবে তুরস্কের সবকটি (৮১টি) প্রদেশে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল সরকারি অনুষ্ঠান, শহীদদের কবর জিয়ারত, সেই ঐতিহাসিক রাতের ঘটনা নিয়ে প্রদর্শনশালা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আত্মত্যাগকারীদের স্মরণে গণসমাবেশ।

প্রেসিডেন্ট এরদোগান ও সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারা পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে, তুর্কি জাতি অভূতপূর্ব ঐক্য ও প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসের অন্যতম বড় হুমকিকে পরাস্ত করেছিল। দেশ ও বিদেশের মাটিতে FETO-এর অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন তারা।

তুরস্ক ও এর জনগণের কাছে ১৫ জুলাই এখন আর কেবল একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের স্মারক নয়; বরং এটি গণতান্ত্রিক বৈধতা, সাংবিধানিক শাসন ও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জনগণের দৃঢ় সংকল্পের এক জাতীয় প্রতীকে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর এই বার্ষিকীটি সেই সাধারণ নাগরিক, পুলিশ কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যদের আত্মত্যাগের কথা মনে করিয়ে দেয়, যারা চরম বিপদের মুখেও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

এক দশক পর, ১৫ জুলাইয়ের রাতটিকে তুরস্কে এমন একটি মুহূর্ত হিসেবে দেখা হয়, যখন জাতি প্রমাণ করেছিল যে শক্তির জোরে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা যায় না এবং বন্দুকের নলের ওপর জনগণের ইচ্ছাই শেষ কথা। সরকারের দাবি, সেই রাতের আত্মত্যাগ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র, স্থিতিস্থাপক প্রতিষ্ঠান এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি পেশাদার সামরিক বাহিনীর ভিত্তি স্থাপন করেছে।

আজ তুরস্ক এই ঘটনাগুলোকে কেবল ইতিহাসের একটি বেদনাদায়ক অধ্যায় হিসেবে দেখে না, বরং এক নতুন যুগের সূচনা হিসেবে গণনা করে। প্রজাতন্ত্রের মুখোমুখি হওয়া অন্যতম কঠিন সংকট থেকে বেরিয়ে এসে দেশটি আজ এমন একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে সচেষ্ট, যা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প এবং জাতীয় প্রতিরক্ষায় নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সম্পূর্ণ সক্ষম।

প্রজাতন্ত্র যখন তার দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পণ করছে, তুর্কি নেতৃত্ব ১৫ জুলাইয়ের ঘটনাকে জনগণের ইচ্ছা ও রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার চিরস্থায়ী অঙ্গীকার হিসেবে উপস্থাপন করছে। সেই ঐতিহাসিক রাতের শিক্ষা ও শহীদদের আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত হয়ে তুরস্ক বলছে–তারা স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি ও শক্তিতে বলীয়ান এক ভবিষ্যতের দিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যাচ্ছে; এমন একটি আধুনিক প্রজাতন্ত্র, যেখানে সামরিক অভিভাবকত্ব ও অভ্যুত্থানচেষ্টা ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে এবং যেখানে প্রতি বছর দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আরও সুসংহত হচ্ছে। ■

অধ্যাপক জন এল. এসপোসিটো (১৯৪০-২০২৬)

এক কিংবদন্তির প্রস্থান:
মুসলিম বিশ্বের অকৃত্রিম বন্ধু জন এস্পোসিটো আর নেই

প্রফেসর জন এল এস্পোসিটোর তিরোধান ইসলামী গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানচর্চার অঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করেছে।

মোহাম্মদ নাসির জাভেদ
প্রবীণ সাংবাদিক ও 'ইয়ারবুক অব দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড' এবং আরব নিউজ-এর সাবেক সম্পাদক, নয়া দিল্লি

অধ্যাপক জন এল. এস্পোসিটোর প্রয়াণে মুসলিম বিশ্ব কেবল একজন বিশিষ্ট ইসলাম বিশেষজ্ঞকেই হারায়নি, বরং হারিয়েছে মুসলিম স্বার্থের এক পরম সুহৃদ এবং প্রজ্ঞাবান মুখপাত্রকে।

মধ্যপ্রাচ্য ও ধর্মীয় বিষয়ক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিত অধ্যাপক এস্পোসিটো পশ্চিমাদের কাছে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরতে দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় উৎসর্গ করেছিলেন। ফলে তিনি ইসলাম এবং মুসলিম-পশ্চিমা সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক ইসমাঈল রাজি আল-ফারুকীর যোগ্য শিষ্য জন এল. এস্পোসিটো ৫০টিরও বেশি গ্রন্থ ও একাডেমিক গবেষণা রচনা, সহ-রচনা এবং সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে অনেকগুলোই বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে প্রমিত রেফারেন্স

হিসেবে স্বীকৃত। অত্যন্ত মানসম্পন্ন এই কাজগুলো ডজনখানেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে–যা এস্পোসিটোকে ইসলামের ওপর অন্যতম সেরা পশ্চিমা পণ্ডিতের মর্যাদা দিয়েছে। ফলে মুসলিম সমাজেও তিনি লাভ করেছিলেন অনন্য শ্রদ্ধা। ব্রুকলিনের এই ইতালীয়-আমেরিকান ক্যাথলিক পণ্ডিত যেখানেই গেছেন–পাকিস্তান, মালয়েশিয়া কিংবা তুরস্ক–মানুষ তাঁকে বিপুল উষ্ণতা ও শ্রদ্ধায় বরণ করে নিয়েছে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে: ভয়েসেস অফ রিজার্জেন্ট ইসলাম, মেকার্স অফ কনটেম্পোরারি ইসলাম, ইসলাম: দ্য স্ট্রেইট পাথ, ইসলাম অ্যান্ড পলিটিক্স, দ্য ইসলামিক থ্রেট: মিথ অর রিয়েলিটি?, হোয়াট এভরিওয়ান নিডস টু নো অ্যাবাউট ইসলাম, দ্য ফিউচার অফ ইসলাম, হু স্পিকস ফর ইসলাম? হোয়াট আ বিলিয়ন মুসলিমস রিয়েলি থিংক (ডালিয়া মোজাহেদের সাথে যৌথভাবে), শরীয়াহ: হোয়াট এভরিওয়ান নিডস টু নো (নাতানা জে. ডেলং-বাসের সাথে যৌথভাবে), এবং ইসলামোফোবিয়া: দ্য চ্যালেঞ্জ অফ প্লুরালিজম ইন দ্য টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি। ৯/১১-এর হামলার পর প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আনহোলি ওয়ার: টেরর ইন দ্য নেম অফ ইসলাম একদিকে যেমন চরমপন্থীদের দ্বারা ধর্মের অপব্যবহারকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল, তেমনি অন্যদিকে একটি সমগ্র সভ্যতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর অপচেষ্টাকেও কড়া জবাব দিয়েছিল।

এস্পোসিটো অক্সফোর্ডের প্রধান প্রধান রেফারেন্স বইগুলোর প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; যার মধ্যে রয়েছে দ্য অক্সফোর্ড ডিকশনারি অফ ইসলাম, দ্য অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অফ ইসলাম, এবং দ্য অক্সফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর, বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলো যখন নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখার জন্য নতুন শত্রুর সন্ধান করছিল, তখন ফাঁকা স্থান পূরণের জন্য ইসলামকেই লক্ষ্য বানানো হয়। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ মাধ্যমকে প্রায় ২০০ কোটি অনুসারীর এই ধর্ম এবং মুসলিম পণ্ডিতদের বিভ্রান্তিকর রূপে চিত্রিত করার কাজে নামানো হয়, তখন অধ্যাপক এস্পোসিটো তাঁর সাহসী পাণ্ডিত্য নিয়ে অবিচল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাখর্যের মাধ্যমে মুসলিমদের সম্পর্কে তৈরি করা ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেন, আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রসার ঘটান এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শিক্ষার্থী, গবেষক, নীতি-নির্ধারক ও ধর্মীয় নেতাদের অনুপ্রাণিত করেন।

একাডেমিক কাজের বাইরেও এস্পোসিটো বহু নীতি-নির্ধারণী পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন, বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বক্তব্য রেখেছেন এবং এনসাইক্লোপিডিয়া সম্পাদনা করেছেন। তিনি 'মিডল ইস্ট স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা' এবং 'আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ রিলিজিয়ন'–উভয় প্রতিষ্ঠানেরই সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অনন্য অবদানের জন্য তিনি বহু আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হন; যার মধ্যে রয়েছে আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ রিলিজিয়নের 'মার্টিন ই. মার্টি অ্যাওয়ার্ড ফর দ্য পাবলিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ রিলিজিয়ন' এবং ইসলামী গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য পাকিস্তানের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'কায়েদ-ই-আজম অ্যাওয়ার্ড'।

অধ্যাপক এস্পোসিটো জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে ধর্ম, আন্তর্জাতিক বিষয়ক এবং ইসলামী শিক্ষার 'ইউনিভার্সিটি প্রফেসর' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যেখানে তিনি ১৯৯৩ সালে 'সেন্টার ফর মুসলিম-ক্রিশ্চিয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডিং' প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে তিনি এই কেন্দ্রটিকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংলাপ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সাহায্য করেছিলেন।

কর্মজীবনের শুরুর দিকে তিনি 'কলেজ অফ দ্য হোলি ক্রস'-এ প্রায় বিশ বছর কাটিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব পড়াতেন, ধর্মীয় শিক্ষা বিভাগের সভাপতিত্ব করেন এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তবে তাঁর গ্রন্থপঞ্জির ব্যাপকতা অনেক সময় তাঁর আরও বড় অর্জনকে আড়াল করে ফেলে। তিনি এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি নির্মাণ করেছিলেন, যার মাধ্যমে মুসলমানদের চিরস্থায়ী সন্দেহভাজন হিসেবে নয়, বরং ইতিহাসের সক্রিয় নির্মাতা ও অংশগ্রহণকারী হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আজীবন একজন একনিষ্ঠ ক্যাথলিক হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক এস্পোসিটো নিজে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যে, কীভাবে গভীর ব্যক্তিগত বিশ্বাস বজায় রেখেও অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সম্ভব। তাঁর পাণ্ডিত্য ও গবেষণা সবসময় এই বার্তাটিই জোর দিয়ে প্রচার করেছে যে–ভীতি নয়, বরং পারস্পরিক বোঝাপড়াই হওয়া উচিত মুসলিম এবং বৃহত্তর বিশ্বের মধ্যকার সম্পর্কের মূল ভিত্তি।

২০২৬ সালের ১৫ জুলাই ৮৬ বছর বয়সে অধ্যাপক জন এল এস্পোসিটো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর এই প্রয়াণে মুসলিম বিশ্ব এবং সামগ্রিকভাবে বৈশ্বিক একাডেমিক অঙ্গন ইসলামের অন্যতম প্রভাবশালী ও সম্মানিত একজন পণ্ডিতকে হারালো।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, অধ্যাপক এস্পোসিটোর সুবিশাল একাডেমিক কর্মভাণ্ডার ও গবেষণামূলক কর্ম যেন আগামী প্রজন্মকেও সততা, সহানুভূতি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার অঙ্গীকার নিয়ে জ্ঞান অন্বেষণে একইভাবে অনুপ্রাণিত করে যায়! ■

সারা বিশ্ব থেকে মুসলিম নেতা, পণ্ডিত, নীতিনির্ধারক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা প্রথম আন্তর্জাতিক ইসলামী সভ্যতা ফোরামের জন্য তাশখন্দে সমবেত হন, যেখানে ইসলামী পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞানের চিরস্থায়ী অবদান উদযাপনের পাশাপাশি শান্তি, সহনশীলতা, জ্ঞানদীপ্তি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

তাসখন্দ থেকে বিশ্বমঞ্চে: ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানের এক ঐতিহাসিক উদযাপন

বিশ্ব যখন ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত ও মেরুকরণে লিপ্ত, ঠিক তখনই তাসখন্দে অনুষ্ঠিত হলো "ইসলামী সভ্যতা: শান্তি, সহনশীলতা ও আলোকবর্তিকার পথ" শীর্ষক আন্তর্জাতিক ফোরাম।

এম. নাসির জাভেদ

সংঘাতময় ও যুদ্ধবিধ্বস্ত এই পৃথিবীতে শান্তি ও সহনশীলতার যেকোনো উদ্যোগই যেন একঝলক তাজা ও স্বস্তিদায়ক বাতাস বয়ে নিয়ে আসে। এটি যেন আশা ও সম্ভাবনার এক মরুদ্যান–যা আমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং এমন কিছু বার্তা তুলে ধরে, যা বর্তমান সময়ে খুব কমই শুনতে পাওয়া যায়।

যুক্তি ও বিবেকের তেমনই এক কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছে উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক ভূখণ্ড থেকে। পারস্য, তুর্কি ও ইসলামী সংস্কৃতির এক চমৎকার মিশ্রণে গড়ে ওঠা এই অঞ্চলকে মানব সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়। উজবেকিস্তান তার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং মনীষীদের গৌরবময় অর্জনের বিশাল ভাণ্ডার সংরক্ষণ ও প্রচারে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাসখন্দে 'সেন্টার ফর ইসলামিক সিভিলাইজেশন' (ইসলামী সভ্যতা কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা এর সাম্প্রতিকতম এক বৃহৎ উদ্যোগ।

আজ যখন বিশ্বের একটি বড় অংশ ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত, ঠিক তখনই তাসখন্দে "ইসলামী সভ্যতা: শান্তি, সহনশীলতা ও আলোকবর্তিকার পথ" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো।

উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক তিনটি শহর–তাসখন্দ, সমরখন্দ এবং তিরমিজে গত ৭-১১ জুলাই প্রথম আন্তর্জাতিক 'ইসলামিক সিভিলাইজেশন ফোরাম' অনুষ্ঠিত হয়। উজবেকিস্তানের 'সেন্টার অফ ইসলামিক সিভিলাইজেশন'-এর সমন্বয়ে এবং দেশটির ধর্মীয় বিষয়ক কমিটি, ইমাম মাতুরিদি, ইমাম বুখারি ও ইমাম তিরমিজি আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র, উজবেকিস্তান মুসলিম বোর্ড এবং উজবেকিস্তান আন্তর্জাতিক ইসলামী একাডেমির যৌথ সহযোগিতায় এই ফোরামের আয়োজন করা হয়।

উগ্রবাদ, ইসলামোফোবিয়া (ইসলামবিদ্বেষ), জেনোফোবিয়া (ভিন্ন সংস্কৃতিভীতি) এবং ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে তৈরি ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লড়তে শান্তি, শিক্ষা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্বের ওপর ফোরামের প্রতিনিধিরা একমত পোষণ করেন। সেই সাথে, ইসলামী তথা বিশ্ব সভ্যতার বিকাশে উজবেকিস্তান এবং বৃহত্তর ট্রান্সঅক্সিয়ানা (মাওয়ারাননাহার) অঞ্চলের ঐতিহাসিক অবদানের কথা সম্মেলনে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়।

ইসলামী বিশ্ব শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ICESCO) এবং উজবেকিস্তানের 'সেন্টার অফ ইসলামিক সিভিলাইজেশন'-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়।

এই ফোরামে বিশ্বের ৪০টি দেশ থেকে ৩০০ জনেরও বেশি বিশিষ্ট বক্তাসহ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও একাডেমিক অঙ্গনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ একত্রিত হন। অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে ছিল বিভিন্ন কৌশলগত অধিবেশন, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর, গবেষণাগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন, জাদুঘর ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন।

উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শওকত মির্জিওয়েভ-এর স্বাগত বক্তব্যটি তাঁর উপদেষ্টা খায়রিদ্দিন সুলতানোভ পাঠ করেন। বার্তায় প্রেসিডেন্ট এই আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়ে উল্লেখ করেন যে, এটি "ইসলামী সভ্যতা এবং এর আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান আগ্রহেরই প্রতিফলন।"

প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, "বিশ্ব আজ এক গভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা ইসলামের মানবিক মূল্যবোধগুলোকে সমুন্নত রাখার গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয়–যে মূল্যবোধ মানুষের মর্যাদা, জ্ঞান অন্বেষণ এবং সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দেয়।"

ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শহরে বিস্তৃত এই ফোরামে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করা হয়। বিশেষ করে মাওয়ারাননাহার (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) এবং বৃহত্তর মধ্য এশিয়া অঞ্চল থেকে বিকশিত জ্ঞানচর্চাকে এখানে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। বহু শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলটি ধর্মীয় বিজ্ঞান, দর্শন, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা, প্রত্নতত্ত্ব, জাদুঘর বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, ডিজিটাল রূপান্তর এবং গবেষণা-প্রকাশনার মাধ্যমে ইসলামী সভ্যতায় অমলিন ছাপ রেখে গেছে।

অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (OIC) এই আয়োজনে পূর্ণ সমর্থন জানায়। ওআইসি-এর সহযোগী সংস্থা IRCICA এবং ICESCO-এর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করেন।

ওআইসি মহাসচিবের পক্ষে রাষ্ট্রদূত তারিগ আলি বাখিত ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং ইমাম আল-বুখারি, ইমাম আল-তিরমিজি ও ইবনে সিনার মতো মহান মনীষীদের জন্মভূমি হিসেবে উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তিনি উল্লেখ করেন, এ ধরনের আয়োজন "বর্তমান সময়ের ঘৃণা ও মেরুকরণের বক্তব্য" মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। একই সাথে তিনি যুক্তি ও বৈচিত্র্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সভ্যতার আসল সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত ঐতিহ্য রক্ষা, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার এবং শান্তির মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে আন্তঃসাংস্কৃতিক ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ওআইসি-এর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

উজবেকিস্তানের ধর্মীয় বিষয়ক কমিটির তথ্য অনুযায়ী, সর্বসম্মতভাবে 'তাসখন্দ ঘোষণা' গ্রহণের মাধ্যমে এই সম্মেলন সমাপ্ত হয়। এই ঘোষণাপত্রে ইসলামী সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ, অধ্যয়ন এবং প্রচারের লক্ষ্যে ১০টি বৈশ্বিক উদ্যোগের রূপরেখা পেশ করা হয়েছে।

সম্মেলনে অংশ নেওয়া প্রতিনিধিদের মাধ্যমে গৃহীত এই ঘোষণাপত্রে, ২০১৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উজবেক প্রেসিডেন্ট শওকত মির্জিওয়েভ উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়–যেখানে তিনি ইসলামী সভ্যতার মানবিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার তাগিদ দিয়েছিলেন।

এর পাশাপাশি, ঘোষণাপত্রে উজবেকিস্তানে 'সেন্টার অফ ইসলামিক সিভিলাইজেশন' প্রতিষ্ঠাকে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ■

ইসলামি ঐতিহ্যের প্রসারে ১০ বৈশ্বিক উদ্যোগ
‘তাসখন্দ ঘোষণা’ গৃহীত

আন্তর্জাতিক ইসলামি সভ্যতা ফোরামে গৃহীত ‘তাসখন্দ ঘোষণা’র মাধ্যমে শান্তি, সহনশীলতা ও ইসলামি জাগরণের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে ছড়িয়ে দিতে ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক উদ্যোগের রূপরেখা উন্মোচন করা হয়েছে। সম্প্রতি তাসখন্দে অনুষ্ঠিত এই ফোরামের মূল প্রস্তাবনা হলো উজবেকিস্তানে সদর দফতর স্থাপন করে একটি ‘বিশ্ব ইসলামি সভ্যতা জোট’ (World Alliance of Islamic Civilization) গঠন করা।

গৃহীত ঘোষণাপত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রধান উদ্যোগগুলোর রূপরেখা নিচে তুলে ধরা হলো:

- **বৈশ্বিক ডিজিটাল নিবন্ধন :** প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, আর্কাইভাল নথি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল সংরক্ষণে একটি সমন্বিত ও নিবেদিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।
- **‘আন্তর্জাতিক কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন :** বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিক্ষায় ইসলামি সভ্যতার অবদান তুলে ধরতে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, সম্মেলন, শিক্ষামূলক প্রকল্প ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে সমন্বিত সহযোগিতা জোরদার করা।
- **আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তন :** ইসলামি সভ্যতার ঐতিহ্য রক্ষা, গবেষণা ও প্রসারে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘আন্তর্জাতিক ইসলামি সভ্যতা পুরস্কার’ চালু করা।
- **আন্তর্জাতিক গবেষণা ফাউন্ডেশন :** বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা, ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ পুনরুদ্ধার এবং তরুণ গবেষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণে সহায়তা দিতে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা তহবিল গঠন করা।
- **ডিজিটাল লাইব্রেরি তৈরি :** পাণ্ডুলিপি, প্রখ্যাত পণ্ডিতদের সংকলন, আর্কাইভাল নথি ও শিক্ষামূলক উপকরণ সমৃদ্ধ একটি বিশ্বমানের ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা।
- **আন্তর্জাতিক বিশ্বকোষ প্রকাশ :** ইসলামি বিশ্বের প্রখ্যাত পণ্ডিতদের জীবনী, বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা, সাংস্কৃতিক ল্যান্ডমার্ক ও বড় অর্জনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে ‘ইসলামি সভ্যতার আন্তর্জাতিক বিশ্বকোষ’ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।
- **বার্ষিক বৈশ্বিক প্রতিবেদন :** ইসলামি ঐতিহ্যের বর্তমান অবস্থা, ঐতিহাসিক স্থানগুলোর সংরক্ষণ পরিস্থিতি, গবেষণার ফলাফল ও উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে প্রতি বছর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা।
- **আন্তর্জাতিক যুব ফোরাম :** ইসলামি বিশ্বের তরুণ গবেষক, পণ্ডিত, শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সংহতি তৈরিতে ‘আন্তর্জাতিক ইসলামি সভ্যতা যুব ফোরাম’ নামে একটি স্থায়ী প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা।
- **আন্তর্জাতিক জাদুঘর ইউনিয়ন :** বিশ্বজুড়ে ইসলামি সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় জাদুঘরগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি, যৌথ প্রদর্শনী আয়োজন এবং ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে ‘আন্তর্জাতিক জাদুঘর ইউনিয়ন’ গঠন করা। ■

সীমান্ত শুল্ক ব্যবস্থার আধুনিকায়নে তুরস্ক-ইরাক

৩০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা

আনাদোলু এজেন্সি

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৩০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে সীমান্ত শুল্ক ব্যবস্থার আধুনিকায়নে কাজ করছে তুরস্ক ও ইরাক। এ লক্ষ্যে দুই দেশের প্রধান সীমান্ত ক্রসিংয়ে কাস্টমস প্রক্রিয়া আধুনিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তুরস্কের বাণিজ্যমন্ত্রী ওমের বোলাত।

২৮ জুলাই আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত তুরস্ক-ইরাক ব্যবসায়িক

গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বলেন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ঠিকাদারি, পরিবহন, প্রতিরক্ষা, পর্যটন ও সেবা খাতে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে বিস্তৃত হচ্ছে।

বোলাত জানান, বর্তমানে তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার। কোভিড-১৯ মহামারির পর এবং জ্বালানির উচ্চমূল্যের সময়ে এ বাণিজ্য ২৪ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তিনি বলেন, ইরাক বর্তমানে তুরস্কের পঞ্চম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার এবং মধ্যমেয়াদে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৩০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে উভয় দেশই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি আরও জানান, তুর্কি ঠিকাদাররা ইরাকে ৪০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ১ হাজার ১৫৭টি প্রকল্প সম্পন্ন করেছেন, যা ইরাককে তুরস্কের তৃতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক ঠিকাদারি বাজারে পরিণত করেছে।

বোলাত ইরাক সরকারের 'অটোমেটেড সিস্টেম ফর কাস্টমস ডাটা' (ASYCUDA)-এর সঙ্গে ইব্রাহিম খলিল সীমান্ত ক্রসিংকে যুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, এ ব্যবস্থা চালু হলে সীমান্তে অনিশ্চয়তা কমবে, কাস্টমস কার্যক্রম দ্রুত হবে এবং দুই দেশের বাণিজ্য ৩০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি বলেন, টিআইআর কনভেনশন বাস্তবায়নে ইরাককে সহযোগিতা করতে তুরস্ক প্রস্তুত রয়েছে। পাশাপাশি বিনিয়োগ সুরক্ষা এবং দ্বৈত কর পরিহার সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলো কার্যকর করার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন।

তুর্কি বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সাম্প্রতিক সংঘাত ও ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি বাণিজ্য, পরিবহন এবং জ্বালানি করিডোর আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এনেছে। এ কারণে কিরকুক-সিহান তেল পাইপলাইন পূর্ণ সক্ষমতায় চালু করা, বসরা থেকে তুরস্কের সিহান টার্মিনাল পর্যন্ত নতুন পাইপলাইন নির্মাণ এবং 'ডেভেলপমেন্ট রোড' প্রকল্পের অগ্রগতিতে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

পরিকল্পিত এ করিডোরের মাধ্যমে ইরাকের গ্র্যান্ড ফাও বন্দর তুরস্ক হয়ে ইউরোপের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। বোলাতের ভাষ্য, এ প্রকল্প নতুন লজিস্টিক কেন্দ্র ও শিল্পনগর গড়ে তোলার মাধ্যমে তুরস্ক-ইরাকের বিনিয়োগ ও ঠিকাদারি কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

তিনি আরও জানান, গত ১৫ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া তুরস্ক-সৌদি আরব ট্রানজিট ভিসা ব্যবস্থা ইরাক হয়ে সৌদি আরব, কুয়েত এবং সমগ্র উপসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে চলতি বছরেই 'তুরস্ক-ইরাক যৌথ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য কমিটি'র পরবর্তী বৈঠক আয়োজনের আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।

সভায় তুরস্কের বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বোর্ডের সভাপতি নাইল অলপাক ইরাকের কেন্দ্রীয় সরকার ও কুর্দি আঞ্চলিক সরকারের পৃথক শুল্ক প্রক্রিয়ার বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের জন্য একাধিকবার প্রবেশের সুযোগসংবলিত বাণিজ্য ভিসা চালু, ই-ভিসা প্রক্রিয়া দ্রুত করা এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক লেনদেন সহজ করারও আহ্বান জানান তিনি। ■

পরিকল্পিত এ করিডোরের মাধ্যমে ইরাকের গ্র্যান্ড ফাও বন্দর তুরস্ক হয়ে ইউরোপের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। বোলাতের ভাষ্য, এ প্রকল্প নতুন লজিস্টিক কেন্দ্র ও শিল্পনগর গড়ে তোলার মাধ্যমে তুরস্ক-ইরাকের বিনিয়োগ ও ঠিকাদারি কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।

উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে আজগাইব শহীদ মসজিদ ও সংলগ্ন মাজার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ছবি : সংগৃহীত

ভারতে মুসলিম ধর্মীয় স্থান ভাঙচুরের অভিযোগ : আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্বেগ

আল-উম্মাহ ডেস্ক

ভারতে একাধিক রাজ্যে ধর্মীয় স্থাপনা, বিশেষ করে মসজিদ, মাদ্রাসা ও ঈদগাহ গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অধিকারবিষয়ক সংস্থা 'জাস্টিস ফর অল' (ঔঁংঃরপব ঋড়ৎ অষষ) এই পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

জানা গেছে, গত ২ জুন উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে অবস্থিত ২০০ বছরের পুরোনো 'আজগাইব শহীদ মসজিদ' গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া একই শহরের প্রায় ১,০০০

বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক 'মসজিদ গঞ্জ শহীদাহ'-ও উচ্ছেদের ঝুঁকিতে রয়েছে বলে জানা গেছে, যা অঞ্চলটির দীর্ঘদিনের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অংশ।

অভিযোগ উঠেছে, গত ৪৫ দিনের মধ্যে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শাসিত রাজ্যগুলো–যেমন দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান ও হরিয়ানায় অন্তত ২৩টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও ঈদগাহ ধ্বংস করা হয়েছে।

আইনি প্রক্রিয়া লঙ্ঘনের অভিযোগ

এসব উচ্ছেদ অভিযানে প্রশাসনিক একটি নির্দিষ্ট ধরণ ফুটে উঠেছে, যেখানে স্থাপনাগুলোকে 'অবৈধ নির্মাণ' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা ও সমালোচকদের দাবি : ১. কোনো প্রকার পূর্ব নোটিশ ছাড়াই এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ২. কোনো ধরণের যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। ৩. মুসলিম ধর্মীয় স্থানগুলোকে বেছে বেছে নিশানা করা হলেও, পাসেই অনুমোদন ছাড়া নির্মিত অন্যান্য ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

মার্কিন সংস্থার 'জাস্টিস ফর অল'-এর বিবৃতি ও অভিযোগ

এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, মাত্র ৫ দিনের ব্যবধানে তিনটি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। এটি দাবি করে যে, এই ধারা ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আইনের চোখে সমতার নীতি নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে। সংস্থাটি নির্দিষ্টভাবে সাম্ভালের 'মসজিদ মুস্তফা কাদরী', বারাণসীর 'শহীদ আজগাইব মসজিদ' এবং জয়পুরের 'নূরানী মসজিদ' ভেঙে ফেলার বিষয়টি তুলে ধরেছে।

'জাস্টিস ফর অল' অভিযোগ করেছে যে, ধর্মীয় স্থাপনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করছে। সংস্থাটি ভারতের বুদ্ধিজীবী ও নাগরিক সমাজকে এক হয়ে এই তথাকথিত 'ঘৃণার রাজনীতি'র বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে। সংস্থাটি যুক্তি দেয় যে, দেশের সংবিধানে নিশ্চিত করা ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং সতর্ক করে দেয় যে, এসব ধ্বংসযজ্ঞের সংখ্যা বৃদ্ধি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতাবোধকে আরও গভীর করতে পারে।

ইতোমধ্যে ভারতে চলমান এই অবৈধ দখলবিরোধী অভিযান নিয়ে ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

যদিও সরকারি কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিকভাবে দাবি করে আসছে যে, সমস্ত উচ্ছেদ অভিযান আইনি ও প্রশাসনিক নিয়মকানুন মেনেই পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে নাগরিক অধিকারকর্মী ও বিশ্লেষকদের মতে, আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ, স্বচ্ছতা ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা না করা গেলে বিচার ব্যবস্থার ওপর থেকে সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। ■

নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শাসিত রাজ্যগুলো–যেমন দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান ও হরিয়ানায় অন্তত ২৩টি মসজিদ, মাদ্রাসা ও ঈদগাহ ধ্বংস করা হয়েছে।

সিরীয় কারিগর আইমান সাঈদ সিরিয়ার আলেপ্পোর ঐতিহাসিক সুক বা বাজারে তাঁর কর্মশালার ভেতরে ঐতিহ্যবাহী কাঠের রিলিফ শিল্পকর্ম প্রদর্শন করছেন। ছবি : আনাদোলু এজেন্সি

সিরীয় কারিগরের হাত ধরে টিকে আছে আলেপ্পোর
১,৪০০ বছরের কাঠের রিলিফ শিল্প

আল-উম্মাহ ডেস্ক

সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় ঐতিহাসিক শহর আলেপ্পোর পুরোনো বাজারে এখনো টিকে আছে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন কাঠের রিলিফ শিল্প। পারিবারিক ঐতিহ্যের এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে ৪২ বছর বয়সী কারিগর আইমান সাঈদ তাঁর ছেলেকেও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তাঁর বিশ্বাস, নতুন প্রজন্মের কাছে এই শিল্পের দক্ষতা পৌঁছে দিতে পারলেই বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা ঐতিহ্যটি টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

২০২৪ সালের ২৮ জুলাই আলেপ্পোর ঐতিহাসিক সুকে (বাজার) নিজের কর্মশালায় বসে কাঠের রিলিফ শিল্পকর্ম তৈরি ও প্রদর্শন করছিলেন সাঈদ। প্রায় তিন দশক ধরে

তিনি এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। মাত্র ১২ বছর বয়সে পরিবারের কাছ থেকেই তিনি এই কারুশিল্পের কাজ শেখেন। এখন সেই জ্ঞান ও দক্ষতা ছেলের হাতে তুলে দিচ্ছেন তিনি।

কাঠের ওপর উঁচু করে নকশা ফুটিয়ে তোলার এই শিল্পে সাধারণত ঐতিহ্যবাহী 'আরাবেস্ক' নকশা ও আরবি ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা যায়। একসময় মসজিদ, গির্জা ও রাজপ্রাসাদের দেয়াল ও ছাদ সাজাতে এই শিল্প ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। তবে আধুনিক স্থাপত্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এর ব্যবহার অনেকটাই কমে গেছে। বর্তমানে কাঠের বাক্স, দেয়ালসজ্জার সামগ্রীসহ বিভিন্ন হস্তনির্মিত পণ্যে এই শিল্পের ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

আলেপ্পো দুর্গের 'থ্রোন হল' বা সিংহাসন কক্ষ এবং জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনায় এখনো এই কারুশিল্পের নিদর্শন রয়েছে। এসব নিদর্শনই প্রমাণ করে, মধ্যপ্রাচ্যের স্থাপত্য ও সংস্কৃতিতে কাঠের রিলিফ শিল্পের দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে।

সাঈদের কর্মশালায় একটি শিল্পকর্ম তৈরির কাজ শুরু হয় কাগজে আঁকা নকশা কাঠের ওপর স্থানান্তরের মাধ্যমে। এরপর বিশেষ ধরনের উদ্ভিজ্জ পেস্ট ব্যবহার করে কাঠের ওপর নকশাগুলো উঁচু করে তোলা হয়। পরবর্তী ধাপে কাঠে রং করা, সুরক্ষামূলক প্রলেপ দেওয়া এবং তুলির সাহায্যে উঁচু নকশায় রং করার কাজ চলে। সবশেষে সূক্ষ্ম কালো রেখা দিয়ে নকশার সীমানা ফুটিয়ে তোলা হয়।

'এই কারুশিল্প কখনোই বিরক্তিকর মনে হয় না,' বলেন সাঈদ। তাঁর মতে, প্রতিটি নতুন শিল্পকর্মে নতুন কোনো সূক্ষ্মতা আবিষ্কারের সুযোগ থাকে। ফলে দীর্ঘদিন কাজ করার পরও এই শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ কমেনি।

কাঠের রিলিফে ব্যবহৃত রং নির্বাচনেও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। সাঈদ জানান, ঘরের আলো ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রং বেছে নেওয়া হয়। যেসব ঘরে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো থাকে, সেখানে তুলনামূলক শীতল রং ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে অন্ধকার বা কম আলোযুক্ত ঘরের জন্য উষ্ণ রং বেছে নেওয়া হয়।

তাঁর কর্মশালায় আসা দর্শনার্থীরাও এই শিল্পের সূক্ষ্মতা দেখে মুগ্ধ হন। সাঈদ জানান, অনেকেই তাঁর তৈরি দেয়াল ও ছাদের জটিল নকশাগুলোর দিকে দীর্ঘক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন।

তবে ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন সাঈদ। তিনি মনে করেন, আধুনিক সময়ে এসব হস্তশিল্পের বাজার সংকুচিত হওয়ায় কারিগরদের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের জন্য সরকারি ও সামাজিকভাবে আরও বেশি সহায়তা প্রয়োজন।

এ জন্য তিনি একটি বিশেষ 'হস্তশিল্প বাজার' গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। সেখানে কাঠের রিলিফ শিল্প, তামার কাজ, বুনন এবং কিলেম বা ঐতিহ্যবাহী কার্পেট তৈরির মতো বিভিন্ন কারুশিল্পের কারিগররা একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন।

সাঈদের ভাষায়, 'সব কর্মশালাকে এক ছাদের নিচে আনতে পারলে এসব পেশাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে কারিগরদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হবে, যা কাজের মান আরও উন্নত করতে সহায়তা করবে।'

নিজের ছেলে এবং নতুন প্রজন্মকে এই শিল্প শেখানোর মধ্য দিয়ে তাই শুধু পারিবারিক ঐতিহ্য নয়, আলেপ্পোর দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন আইমান সাঈদ। ■

যুক্তরাষ্ট্রে নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারের পক্ষে বাড়ছে জনসমর্থন, বলছে জরিপ

আল-উম্মাহ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত ইকোনমিস্ট/ইউগভ (উপড়হড়সরংঃ/ণড়ঁএড়া) জরিপে দেখা গেছে, প্রায় অর্ধেক মার্কিন নাগরিক মনে করেন, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করলে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) পরোয়ানা অনুযায়ী তাকে গ্রেপ্তার করা উচিত।

২৫ থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত ১ হাজার ৫৫৯ জন মার্কিন প্রাপ্তবয়স্কের ওপর পরিচালিত এই জরিপে ৪৯ শতাংশ উত্তরদাতা নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারের পক্ষে মত দিয়েছেন। বিপরীতে ২৭ শতাংশ এর বিরোধিতা করেছেন, আর ২৩ শতাংশ এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট মত দেননি।

জরিপে আরও দেখা যায়, শুধু ফিলিস্তিনপন্থী নয়, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের মধ্যেও নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারের পক্ষে মত রয়েছে। ট্রাম্পের ভোটারদের ২৩ শতাংশও এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন।

এ ছাড়া ৪৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, গাজায় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের জন্য নেতানিয়াহু দায়ী। অন্যদিকে ২৪ শতাংশ এ মতের সঙ্গে একমত নন। একই জরিপে ৪৩ শতাংশ বলেছেন, ইসরায়েল গাজায় ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছে বলে তারা মনে করেন। যদিও ২৪ শতাংশ এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা মনে করেন, নেতানিয়াহুর কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সম্পর্কেরও ক্ষতি করেছে।

এই ফলাফল সাম্প্রতিক অন্যান্য জরিপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে ইসরায়েল ও নেতানিয়াহুর প্রতি মার্কিন জনমতের অবনতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পিউ রিসার্চ সেন্টার-এর ২০২৬ সালের জুলাইয়ের জরিপে দেখা গেছে, বর্তমানে ৬০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ইসরায়েল সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন, যা এক বছর আগে ছিল ৫৩ শতাংশ। একই সঙ্গে ৫৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, বিশ্ব পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেতানিয়াহুর প্রতি তাঁদের খুব কম বা কোনো আস্থা নেই। ২০২৫ সালে এই হার ছিল ৫২ শতাংশ।

পিউর জরিপে আরও উঠে এসেছে, ইসরায়েল সরকারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব কমে ৩২ শতাংশে নেমে এসেছে, আর নেতিবাচক মনোভাব বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২ শতাংশে।

এদিকে গাজায় চলমান সামরিক অভিযান নিয়ে আন্তর্জাতিক সমালোচনার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে জনমত প্রভাবিত করতে ইসরায়েলের বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের খবরও সামনে এসেছে।

বিভিন্ন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েল সরকার সাবেক ট্রাম্প ক্যাম্পেইন ম্যানেজার ব্র্যাড পারস্কেলের মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রায় ৪ কোটি ৬৫ লাখ ডলারের চুক্তি করেছে। অভিযোগ রয়েছে, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল এমন ওয়েবসাইট ও অনলাইন কনটেন্ট তৈরি করা, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) চ্যাটবটগুলো ইসরায়েল ও গাজা-সংক্রান্ত তথ্য কীভাবে উপস্থাপন করে, তা প্রভাবিত করতে পারে।

প্রতিবেদনগুলোতে আরও বলা হয়েছে, এসব কনটেন্টের মাধ্যমে ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা, গণহত্যার অভিযোগ খণ্ডন করা এবং অনলাইনে ইসরায়েলপন্থী তথ্যের উপস্থিতি বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে সাম্প্রতিক জরিপগুলোর ফলাফল ইঙ্গিত দিচ্ছে, জনসংযোগ ও ডিজিটাল প্রচারণায় বিপুল বিনিয়োগের পরও যুক্তরাষ্ট্রে জনমত উল্টো দিকে যাচ্ছে। ক্রমেই বেশি সংখ্যক মার্কিন নাগরিক ইসরায়েল সম্পর্কে নেতিবাচক অবস্থান নিচ্ছেন এবং নেতানিয়াহুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন। ■

গাজায় ক্ষুধা সংকট কিছুটা কমেছে, সহায়তা কমলে ফের বাড়ার আশঙ্কা

আল-উম্মাহ ডেস্ক

গাজায় গত বছর কিছু এলাকায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি ঘোষণার পর মানবিক পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে লাখ লাখ মানুষ এখনো তীব্র খাদ্যসংকটে রয়েছেন। ত্রাণ সংস্থাগুলো সতর্ক করে বলেছে, অর্থায়নের ঘাটতি এবং মানবিক সহায়তা কমে গেলে ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ সাম্প্রতিক এই অগ্রগতি আবারও ভেস্তে যেতে পারে।

সাহায্যের মাত্রা অব্যাহত না থাকলে বছরের শেষের দিকে তীব্র ক্ষুধার সম্মুখীন মানুষের সংখ্যা বেড়ে ১৪ লাখেরও বেশি (গাজার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৭%) পৌঁছাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ছবি: আনাদোলু এজেন্সি

খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়নকারী বৈশ্বিক সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি) বুধবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২৫ সালের অক্টোবরে ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির পর গাজায় ত্রাণ সরবরাহ বেড়েছে এবং যুদ্ধের তীব্রতা কমেছে। এর ফলে বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে তীব্র অপুষ্টির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

তবে আইপিসি বলেছে, এই উন্নতি অত্যন্ত ভঙ্গুর। মানবিক সহায়তা কমে গেলে পরিস্থিতি দ্রুত আবারও আগের ভয়াবহ অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।

আইপিসির হিসাব অনুযায়ী, এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত গাজার প্রায় ১২ লাখ মানুষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশ, তীব্র খাদ্যসংকটে ছিলেন। তাদের খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি 'ধাপ ৩: সংকট' বা তার চেয়েও খারাপ পর্যায়ে ছিল। এর মধ্যে ২ লাখ ১২ হাজারের বেশি মানুষ ছিলেন 'ধাপ ৪: জরুরি' পর্যায়ে, যা দুর্ভিক্ষের ঠিক আগের ধাপ।

বর্তমান মাত্রায় সহায়তা অব্যাহত না থাকলে বছরের শেষ নাগাদ তীব্র ক্ষুধার মুখে থাকা মানুষের সংখ্যা বেড়ে ১৪ লাখেরও বেশি হতে পারে। অর্থাৎ গাজার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৭ শতাংশ মানুষ তখন তীব্র খাদ্যসংকটে পড়তে পারেন।

গত বছরের আগস্টে গাজার কিছু এলাকায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি চিহ্নিত করা হলেও পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে আইপিসি বলেছে, বেশিরভাগ পরিবারের খাদ্য গ্রহণ এখনো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। প্রায় দুই বছরের যুদ্ধ, বারবার বাস্তুচ্যুতি ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর গাজার বহু পরিবার এখনো দিনে এক বা দুই বেলা না খেয়ে থাকছে। অনেকে দাতব্য রান্নাঘরের ওপর নির্ভর করছেন, খাবারের জন্য ভিক্ষা করছেন কিংবা যা পাওয়া যাচ্ছে তা দিয়েই কোনোভাবে দিন কাটাচ্ছেন।

যুদ্ধবিরতির পর মানবিক সহায়তা বাড়ায় পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে আইপিসি। তবে সংস্থাটি বলেছে, গাজাজুড়ে এই অগ্রগতি সমান নয় এবং এর বড়

অংশই এখনো আন্তর্জাতিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। সামান্য পরিমাণে মানবিক সহায়তার প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হলেও সাম্প্রতিক এই অগ্রগতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছে সংস্থাটি।

শিশুরাই এখনো সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তীব্র অপুষ্টির হার কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে নেমে এলেও দীর্ঘদিনের খাদ্যাভাবের কারণে 'স্টান্টিং' বা বয়সের তুলনায় শারীরিক বৃদ্ধির ব্যাহত হওয়ার ঘটনা বাড়ছে। দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির কারণে সৃষ্ট এই সমস্যা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে।

ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল বলেন, পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও অনেক শিশু এখনো ক্ষুধার কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। দীর্ঘদিন পর্যাপ্ত পুষ্টি না পাওয়া কিছু শিশু হয়তো আর কখনোই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে না।

এদিকে গাজায় পুষ্টি কর্মসূচিগুলোও সংকুচিত হয়ে আসছে বলে জানিয়েছে আইপিসি। অর্থসংকটের কারণে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীদের জন্য পরিচালিত পরিপূরক পুষ্টি কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি কমে প্রায় ৬ হাজারে নেমে এসেছে। মানবিক সংস্থাগুলো আর্থিক সংকট এবং গাজায় কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনিশ্চয়তার মুখে থাকায় এই সহায়তা আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ত্রাণ সংস্থাগুলো গাজার পানি ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার ধ্বংস নিয়েও গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে। তাদের আশঙ্কা, অকেজো পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানির সংকট এবং অতিরিক্ত জনাকীর্ণ আবাসনব্যবস্থার কারণে রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে।

গাজার প্রায় ২১ লাখ বাসিন্দার অধিকাংশই বাস্তুচ্যুত হয়ে এখনো তাঁবু কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গাদাগাদি করে বসবাস করছেন। সেখানে বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য মৌলিক পরিষেবার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সহায়তা কিছুটা বাড়লেও খাবার এখনো অপ্রতুল এবং অনেকের নাগালের বাইরে। খান ইউনিসের একটি দাতব্য রান্নাঘরের খাবারের ওপর নির্ভরশীল বাস্তুচ্যুত মা রানা আবু বকর বলেন, পরিস্থিতি এখনো অত্যন্ত করুণ। পানি ও খাবারের সংকটের পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামও আকাশচুম্বী।

তবে গাজায় খাদ্য সরবরাহে বাধা দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইসরাইল। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২৫ সালের অক্টোবরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে তারা গাজায় ১৮ লাখ টনেরও বেশি খাদ্য প্রবেশে সহায়তা করেছে এবং কোনো খাদ্যবাহী চালান আটকানো হচ্ছে না।

গাজায় ত্রাণ সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা ইসরাইলি সামরিক সংস্থা কোগাট আইপিসির প্রতিবেদনকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। সংস্থাটির দাবি, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির নির্ধারিত প্রয়োজনের তুলনায় গাজায় যে পরিমাণ খাদ্য প্রবেশ করেছে, ইসরাইলের দেওয়া সেই তথ্য প্রতিবেদনে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি।

ইসরাইলি কর্মকর্তাদের দাবি, গাজায় প্রবেশ করা ত্রাণের পরিমাণ নয়, বরং মূল সমস্যা হলো ভূখণ্ডটির অভ্যন্তরে ত্রাণ বিতরণব্যবস্থা। তারা হামাসের বিরুদ্ধে মানবিক সহায়তা সরিয়ে নেওয়া এবং ত্রাণ লুটের অভিযোগও করেছে। তবে হামাস এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ত্রাণ সংস্থাগুলো ইসরাইলের এই বক্তব্যও প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের দাবি, গাজায় প্রবেশ করা খাদ্যের বড় একটি অংশ মানবিক সংস্থার মাধ্যমে নয়, বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে যাচ্ছে। চিকিৎসাকর্মীরা সতর্ক করে বলেছেন, বাজারে পাওয়া খাবার জরুরি খাদ্য সহায়তার মতো পুষ্টিকর নয়। ফলে তীব্র অপুষ্টি থেকে সেরে ওঠা শিশুদের জন্য এটি বাড়তি ঝুঁকি তৈরি করছে।

কোগাট অবশ্য স্বীকার করেছে যে যুদ্ধবিরতির পর গাজায় প্রবেশ করা মোট সরবরাহের প্রায় অর্ধেকই বাণিজ্যিক পণ্য। তবে মানবিক সহায়তার তুলনায় বাণিজ্যিক চালানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অভিযোগ তারা অস্বীকার করেছে।

ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের দাবি, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরাইলে হামাসের হামলার মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সূচনা হয়। ওই হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ মানুষ নিহত এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়। এরপর গাজায় ইসরাইলের সামরিক অভিযানে ৭৩ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তাদের দাবি, নিহতদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। ২০২৫ সালের অক্টোবরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরও ইসরাইলি হামলা ও গোলাবর্ষণে ১ হাজার ১৮৫ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহকারী আইপিসি বলেছে, গাজার সাম্প্রতিক এই সামান্য উন্নতি পুরোপুরি অব্যাহত মানবিক সহায়তা ও আন্তর্জাতিক অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির জরুরি প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদানবিষয়ক পরিচালক রস স্মিথ বলেন, সাম্প্রতিক উন্নতিগুলো দেখিয়েছে ধারাবাহিক মানবিক সহায়তা কতটা কার্যকর হতে পারে। তবে এই সহায়তা বন্ধ বা কমে গেলে অর্জিত অগ্রগতি দ্রুত মুছে যেতে পারে।

তিনি বলেন, গত সাত মাসে গাজায় বিশেষ করে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার কারণেই এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এই অগ্রগতি ধরে রাখতে হলে মানবিক সহায়তা প্রবেশের ধারাবাহিক সুযোগ এবং নিয়মিত অর্থায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। ■

সূত্র : ডেইলি সাবাহ

যখন ইবাদত আচরণকে সংশোধন করে না

মুহাম্মদ আবু আজ্জুর

প্রার্থনা (সালাত), রোজা কিংবা তাহাজ্জুদের আধিক্য কোনো সমস্যা নয়; এগুলো তো মুমিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আসল সমস্যা তখন তৈরি হয়, যখন এগুলোর ইতিবাচক প্রভাব মানুষের ন্যায়বিচার, দয়া ও আমানতদারিতায় প্রতিফলিত হয় না। আর যখন অন্যায়-অবিচার জায়েজ করতে, উপদেশদাতাদের মুখ বন্ধ করতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে, কিংবা ঐক্য রক্ষার নামে দল-উপদল তৈরি করে বিভেদ সৃষ্টিতে ধর্মীয় স্লোগান ব্যবহার করা হয়–তখনই বিপত্তি ঘটে।

আমরা কারও অন্তরের খবর রাখি না, আর কারও ইবাদত কবুল হলো কি হলো না–সেই বিচার করার অধিকারও আমাদের নেই। সেই ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর। তবে

শরীয়তের মানদণ্ডে প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিচার করার অধিকার উম্মাহর অবশ্যই আছে। উম্মাহ প্রশ্ন তুলতেই পারে: 'চরিত্রের ওপর সালাতের প্রভাব কোথায়?', 'ন্যায়বিচারে কুরআনের প্রতিফলন কোথায়?', 'দীর্ঘ সিজদার সাথে মানুষের অধিকার হরণ বা আত্মসাৎ কীভাবে খাপ খায়?' আর 'ভ্রাতৃত্বের বুলি আওড়ানোর পাশাপাশি শত্রুতার আগুন জ্বালানো কীভাবে সম্ভব?'

যে ইবাদত অন্যায় ও পাপাচার ঠেকাতে পারে না, তা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আল-আনকাবুত: ৪৫)

তাই একজন মানুষ ইবাদত করার পরেও যদি অবিচার, মিথ্যা, গীবত (পরনিন্দা), অপবাদ ও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়, তবে তার উচিত নিজের অন্তরে ও আচরণে ইবাদতের প্রভাব কতটুকু–তা খতিয়ে দেখা। ইবাদতের আধিক্যকে যেন সে সমালোচনা ও জবাবদিহিতা থেকে বাঁচার ঢাল না বানায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন:

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অসন্তোষজনক।" (সূরা আস-সাফ: ২-৩)

শুরা (পরামর্শ) ব্যবস্থা অচল রেখে শুরার কথা বলা, পদের প্রতি লোভ-লালসা বজায় রেখে নিঃস্বার্থতার বুলি আওড়ানো, আর প্রতিটি উপদেশদাতার কণ্ঠরোধ করে ঐক্যের জিকির তোলা কখনো সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সা. স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন একশ্রেণীর মানুষ 'দেউলিয়া' (মুফলিস) হয়ে উপস্থিত হবে। তারা সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে আসবে; কিন্তু একই সাথে তারা কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও ওপর অপবাদ চাপিয়েছিল কিংবা কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল। ফলে মজলুমদেরকে তার নেকী থেকে প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং, ইবাদত কখনো বান্দার অধিকার (হক্কুল ইবাদ) খর্ব করার লাইসেন্স দেয় না, আর না তা অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ ও সংশোধনের দায় থেকে মুক্তি দেয়।

সবচেয়ে বিপজ্জনক বিচ্যুতি: ভুলকে জায়েজ করতে ধর্মের ব্যবহার

কোনো দ্বীনি আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হলো–যখন প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিস্বার্থকে দ্বীনের পোশাক পরানো হয় এবং দলগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থকে 'শরয়ী দায়িত্ব' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তখন কোনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করাকে দ্বীনের বিরোধিতা হিসেবে গণ্য করা হয়; জবাবদিহিতার দাবি তোলাকে ধরা হয় দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে, আর আন্তরিক উপদেশকে মনে করা হয় ষড়যন্ত্র!

এখানেই মূল কিতাব বা আদর্শের স্থান দখল করে নেয় ব্যক্তি। নেতৃত্ব হয়ে ওঠে সমালোচনার উর্ধ্বে। ধর্মকে তখন ব্যবহার করা হয় ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে, অথচ ক্ষমতার মূল কাজই হওয়ার কথা ছিল ধর্মের সেবাদান।

মতবিরোধ কোনো অপরাধ নয়

মতবিরোধ মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি, আর মতের ভিন্নতা জীবনেরই লক্ষণ। কিন্তু এই মতবিরোধ তখনই অন্যায়ে রূপ নেয়, যখন তা পরিচালনা করা হয় মিথ্যা, তথ্য বিকৃতি, ভিন্নমতাবলম্বীদের 'গাদ্দার' বা দেশদ্রোহী আখ্যা প্রদান, তাদের অতীতকে কলঙ্কিত করা এবং দল থেকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়াকে ধর্মীয় রূপ দেওয়ার মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ বলেন:

"তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, তা না হলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।" (সূরা আল-আনফাল: ৪৬)

দলের মধ্যে ফাটল সৃষ্টিকারী শুধু সেই ব্যক্তি নয় যে প্রকাশ্যে দলত্যাগের ঘোষণা দেয়; বরং সেই ব্যক্তিও সমান অপরাধী যে সংশোধনের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়, মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান করে, শুরা ব্যবস্থাকে অচল করে এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের অবরুদ্ধ করে রাখে। অন্যদিকে, উপদেশদাতাকেও হতে হবে ইনসাফপন্থী, সত্যতা যাচাইকারী এবং গোপনীয়তা রক্ষাকারী। সংশোধনকে যেন সে জনসম্মুখে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা কিংবা ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর হাতিয়ার না বানায়।

এভাবেই একটি মহৎ উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠান ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে।

ইসলামী সভ্যতার পুনর্গঠনের কাজ শুধু ফাঁপা স্লোগান দিয়ে হয় না; বরং এর জন্য প্রয়োজন সত্যবাদী মানুষ, ন্যায়পরায়ণ প্রতিষ্ঠান, শুরাভিত্তিক নেতৃত্ব, দক্ষ প্রশাসন, দায়িত্বের পর্যায়ক্রমিক হস্তান্তর এবং গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণের মানসিকতা।

যখন ইনসাফ বা ন্যায়বিচার হারিয়ে যায়, তখন সত্যবাদীরা দূরে সরে যায় আর চাটুকাররা কাছে চলে আসে। যখন উপদেশ দেওয়া অবরুদ্ধ হয়, তখন ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে। যখন ধর্মকে ব্যবহার করে ব্যক্তিদের 'ভুলের উর্ধ্বে' বানানো হয়, তখন মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা উঠে যায়। আর আস্থা হারিয়ে গেলে সেই প্রতিষ্ঠানের গড়ার ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি নিজের ছোট একটি সংগঠনের ভেতরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়, বড় কোনো দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতা তার কতটুকু–তা তার গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত।

জেদকে 'অটলতা' নাম দেবেন না

- অটলতা (ইস্তেকামাত) হলো: পদের লোভ বা ব্যক্তি-স্বার্থের ক্ষতি হলেও নীতির ওপর অবিচল থাকা।
- আর জেদ (গোঁড়ামি) হলো: মূল আদর্শ ধ্বংস হয়ে গেলেও নিজের পদ আঁকড়ে ধরে রাখা।

- অটলতা হলো: সত্যকে গ্রহণ করা, তা যার পক্ষ থেকেই আসুক না কেন।
- আর অহংকার হলো: সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা, শুধু এই কারণে যে তা কোনো বিরোধীর পক্ষ থেকে এসেছে।
- অটলতা হলো: ভুল প্রকাশ পাওয়ার পর নিজের সিদ্ধান্ত সংশোধন করে নেওয়া।
- আর স্বৈরাচার হলো: প্রতিটি সমালোচনাকে ষড়যন্ত্র মনে করা।

মানুষের অধিকার হরণের তওবা সস্তা নয়

যে ব্যক্তি কোনো ফিতনা উস্কে দিয়েছে, কোনো নির্দোষ মানুষকে কলঙ্কিত করেছে, কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে–তার জন্য শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয় যে: "আমি ইজতিহাদ করেছিলাম, ভুল হয়ে গেছে।"

বান্দার হকের সাথে জড়িত অন্যায়ের তওবা করতে হলে প্রয়োজন:

১. প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করা।
২. ক্ষতিগ্রস্তের কাছে ক্ষমা চাওয়া।
৩. মানুষের অধিকার বা পাওনা ফিরিয়ে দেওয়া।
৪. ছড়ানো মিথ্যাচার সংশোধন করা।
৫. জুলুম বা অবিচার দূর করা।
৬. সমঝোতা ও পুনর্মিলনের পথ উন্মুক্ত করা।
৭. এবং নিজের পদ বা অবস্থান যদি ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে নির্দ্বিধায় পদত্যাগ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের (বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের) কর্ম সফল করেন না।" (সূরা ইউনুস: ৮১)

তাই সুন্দর নাম দিলেই কোনো অপকর্ম বা ফাসাদ পুণ্যকর্মে রূপান্তর হয় না, আর ধর্মীয় মোড়কে আবৃত করলেই বিভেদ সৃষ্টি করা 'ঐক্য' হয়ে যায় না।

সঠিক পথে ফেরার উপায়

সঠিক পথে ফিরে আসার প্রথম পদক্ষেপ হলো সবাইকে একটি মাত্র দাঁড়িপাল্লার অধীনে নিয়ে আসা: নবীগণ ছাড়া আর কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে (মাসুম) নন, এবং কোনো দায়িত্বশীলই সমালোচনা ও জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নন।

এর সূচনা হতে হবে বাস্তবসম্মত শুরা ব্যবস্থা, অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রকৃত সমঝোতা, পদের নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ, স্বচ্ছ নির্বাচন, স্বাধীন তদারকি পরিষদ, উপদেশদাতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং এমন এক তারবিয়ত (শিক্ষা) ব্যবস্থার মাধ্যমে যা ন্যায়বিচার, নম্রতা ও সমালোচনা গ্রহণের মানসিকতাকে নেতৃত্বের মূল মাপকাঠি বানাবে।

উম্মাহর আজ ঐক্যের ওপর আরও বড় বড় চটকদার বক্তব্যের প্রয়োজন নেই; বরং প্রয়োজন এমন কিছু আত্মত্যাগী নেতার, যারা সত্য ও ঐক্যের খাতিরে নিজেদের পদ ও স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

যে সালাতের প্রভাব মানুষের সাথে ন্যায়বিচারে প্রকাশ পায় না, তা পুনর্বিবেচনা করা দরকার। যে ইবাদত মানুষের ভেতরের অহংকার ভাঙতে পারে না, তা সংশোধন করা প্রয়োজন। আর যে নেতৃত্ব সামান্য উপদেশে সংকুচিত হয়ে পড়ে, তা প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের প্রধান শর্তই হারিয়ে ফেলে।

হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার আগে

- সিজদার আধিক্য দেখে ধোঁকায় পড়বেন না; বান্দার অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও হিসাব-নিকাশের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
- দোয়ার সময় চোখের জল দেখেও ধোঁকায় পড়বেন না; কারণ যাদের ওপর জুলুম করা হয়েছে, তাদের আর্তনাদও কিন্তু আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়।
- বিভেদ সৃষ্টিকে 'সংশোধন' নাম দেবেন না, স্বৈরাচারী মনোভাবকে 'অটলতা' বলবেন না, আর নিজের পদের ভয়কে 'দ্বীনের ভয়' বলে চালিয়ে দেবেন না।

যে সালাতের প্রভাব মানুষের সাথে ন্যায়বিচারে প্রকাশ পায় না, তা পুনর্বিবেচনা করা দরকার। যে ইবাদত মানুষের ভেতরের অহংকার ভাঙতে পারে না, তা সংশোধন করা প্রয়োজন। আর যে নেতৃত্ব সামান্য উপদেশে সংকুচিত হয়ে পড়ে, তা প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের প্রধান শর্তই হারিয়ে ফেলে।

তাই সালাত কায়েম করুন, এবং তার সাথে সাথে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করুন।
কুরআন পড়ুন, এবং নিজের জীবনের ফায়সালা এর আলোকেই করুন।
ঐক্যের ডাক দিন, এবং ভেদাভেদের সমস্ত দেয়াল ও কারণ দূর করুন।
কখনোই আল্লাহর পবিত্র নামকে নিজেদের প্রবৃত্তির আড়াল বানাবেন না। ■

শারীরিক সহিংসতা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের চেষ্টা থেকে শুরু করে ভয়ভীতি প্রদর্শন, হয়রানি ও অনলাইনে গালাগাল—মুসলিমবিদ্বেষী সহিংসতার এই প্রবণতা যুক্তরাজ্যে আইনপ্রণেতা ও সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে এবং তারা সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

যুক্তরাজ্যে ইসলামোফোবিয়া বাড়ছে, প্রতি পাঁচদিনে ১ মসজিদে হামলা

আল-উম্মাহ ডেস্ক

যুক্তরাজ্যে মুসলিমবিদ্বেষ বা ইসলামোফোবিয়া উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। গত এক বছরে দেশজুড়ে ৭০টিরও বেশি মসজিদ হামলার শিকার হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি পাঁচদিনে একটি মসজিদে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

যুক্তরাজ্য সরকারের সঙ্গে অংশীদারত্বে কাজ করা পর্যবেক্ষণ সংস্থা ব্রিটিশ মুসলিম ট্রাস্ট (বিএমটি) এ তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটির হিসাবে, মসজিদে হামলার পাশাপাশি মুসলিমদের বিরুদ্ধে শারীরিক সহিংসতা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের চেষ্টা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, হয়রানি এবং অনলাইনে গালাগালসহ বিভিন্ন ধরনের মুসলিমবিদ্বেষী ঘটনা বেড়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইনপ্রণেতা ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা

সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

বিএমটির তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের মধ্যে লন্ডন, গ্রেটার ম্যানচেস্টার ও ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসে মুসলিমবিদ্বেষী ঘটনার হার সবচেয়ে বেশি। শুধু লন্ডনেই গত এক বছরে মসজিদে হামলার নয়টি পৃথক ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। আর বার্মিংহামের একটি মসজিদে ১২ মাসের মধ্যে তিনবার হামলা চালানো হয়েছে।

সরকারি পরিসংখ্যানেও মুসলিমবিদ্বেষী অপরাধ বৃদ্ধির বিষয়টি উঠে এসেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে মুসলিমবিদ্বেষী ঘৃণাজনিত অপরাধ ১৯ শতাংশ বেড়েছে। ২০২৪ সালের মার্চে শেষ হওয়া বছরে এ ধরনের অপরাধের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৬৯০টি, যা ২০২৫ সালের মার্চে শেষ হওয়া বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ১৯৯টিতে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুক্তরাজ্য সরকার ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে মসজিদ, ইসলামিক ধর্মীয় বিদ্যালয় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা জোরদারে ৪ কোটি পাউন্ড পর্যন্ত বরাদ্দ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ অর্থ দিয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা, অনুপ্রবেশ শনাক্তকারী অ্যালার্ম, সীমানা প্রাচীর এবং প্রশিক্ষিত নিরাপত্তাকর্মীর মতো নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা রয়েছে।

তবে ধর্মীয় নেতা ও অধিকারকর্মীরা বলছেন, সরকারি সহায়তা পেতে দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, কঠোর প্রমাণের শর্ত এবং ১৮ মাস পর্যন্ত বিলম্বের কারণে অনেক মসজিদ ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠান এখনো পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছাড়াই রয়েছে।

বিএমটির প্রধান নির্বাহী আকিলা আহমেদ বলেন, মসজিদে হামলার ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। তাই মসজিদগুলোকে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, বর্তমানে নিরাপত্তা সহায়তার জন্য আবেদন করলে অনুদান দেওয়ার আগে নির্ভরযোগ্য হুমকির ব্যাপারে বিস্তারিত প্রমাণ চাওয়া হয়। ফলে অনেক প্রতিষ্ঠান সহায়তার অপেক্ষায় দীর্ঘ সময় অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে।

আকিলা আহমেদের ভাষায়, শুধু মসজিদ হওয়াটাই অনেক ক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অনেক মসজিদকে মাসের পর মাস আতঙ্কের মধ্যে থেকে সহায়তার অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ তুলনামূলক কম গুরুতর ঘটনা হিসেবেও এসব অভিযোগে যথাযথ সাড়া দিচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন।

জনপ্রতিনিধি ও আইনপ্রণেতারাও পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে শারীরিক সহিংসতার সঙ্গে রাজনৈতিক বক্তব্য ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উসকানিমূলক প্রচারের যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করছেন।

লন্ডনের মেয়র সাদিক খান মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাব বৃদ্ধির জন্য রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির উসকানিমূলক বক্তব্যকে দায়ী করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, এ ধরনের চরম বৈরিতা শুধু মুসলিমদের নয়, বরং সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সামাজিক সংহতিকেই হুমকির মুখে ফেলছে।

সাদিক খান এক্সে লিখেছেন, গত এক বছরে মুসলিমবিদ্বেষী ঘৃণা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অনলাইন ও সংবাদমাধ্যমে দেওয়া উসকানিমূলক ও ঘৃণামূলক বক্তব্য এর অন্যতম কারণ। এভাবে পরিস্থিতি চলতে দেওয়া যায় না। সব সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আইনপ্রণেতারাও সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। লেবার পার্টির এমপি ডায়ান অ্যাবোট মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহিংসতা মোকাবিলায় সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত উদ্যোগ ও বিশেষায়িত সম্পদ না থাকার সমালোচনা করেছেন।

তিনি এক্সে বলেন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ মাত্রার সহিংসতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সরকারের জোরালো নিন্দা, জরুরি বৈঠক এবং বিশেষ টাস্কফোর্স কোথায়—এ প্রশ্নও তোলেন তিনি। ■

সূত্র : ডেইলি সাবাহ

ইসরাইলি হামলার মধ্যে ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন ফিলিস্তিনিদের

আল-উম্মাহ ডেস্ক

২০২৩ সালের ইসরাইলি হামলায় নিহত হাসায়না ও আবু শারিয়া গোত্রের ১১২ সদস্যের মরদেহের অবশিষ্টাংশ ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধারের পর গাজা শহরে ফিলিস্তিনি পতাকায় জড়িয়ে তাদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। ছবি: রয়টার্স

গাজায় ইসরাইলি হামলা অব্যাহত থাকায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত শান্তি পরিকল্পনার বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ফিলিস্তিনিরা। তাদের অভিযোগ, একদিকে যুদ্ধ বন্ধ ও হামাসের অস্ত্রসংবরণের কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে ইসরাইলি হামলা ও দখলদারত্ব অব্যাহত রয়েছে। গত বছরের যুদ্ধবিরতির পর অন্যতম প্রাণঘাতী দিনে ইসরাইলি হামলায় ১৮ জন নিহত হওয়ার পর গাজাবাসীর মধ্যে এ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

গত বৃহস্পতিবারকে অক্টোবর মাসে সম্মত গাজা শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'একটি বড় মাইলফলক' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন ট্রাম্প। তিনি বলেছিলেন, হামাস অস্ত্রসংবরণ করবে এবং ইসরাইল ধাপে ধাপে গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে।

তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শুরুতেই দেখা দিয়েছে নানা জটিলতা। ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কাটজ রবিবার বলেছেন, হামাস অস্ত্রসংবরণ না করা এবং তাদের সুড়ঙ্গ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত গাজা থেকে ইসরাইলি সেনারা 'একচুলও' সরবে না।

অন্যদিকে হামাসের বক্তব্য, ফিলিস্তিনিদের অস্ত্রসংক্রান্ত চুক্তির অংশ বাস্তবায়নের আগে ইসরাইলকে গাজায় হামলা বন্ধ করতে হবে।

যুদ্ধবিরতি তদারকির দায়িত্বে থাকা ট্রাম্পের 'বোর্ড অব পিস'-এর গাজা বিষয়ক দূত নিকোলাই ম্লাদেনভ সোমবার ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে 'গঠনমূলক ও বিস্তারিত' বৈঠক করেছেন বলে জানিয়েছে বোর্ডটি। পরে এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে বোর্ড বলেছে, তাদের লক্ষ্য হলো গাজা উপত্যকা থেকে অস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এবং অস্ত্রনির্ভর শাসনব্যবস্থা থেকে বেসামরিক প্রশাসনে রূপান্তর।

বোর্ডের ভাষ্য, এ লক্ষ্য অর্জন একটি প্রক্রিয়া এবং পরবর্তী ধাপে সেই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নির্ধারণ করা হবে। একই সঙ্গে অক্টোবরের মার্কিন মধ্যস্থতায় হওয়া যুদ্ধবিরতির অধীনে নির্ধারিত সামরিক সীমারেখা, তথা তথাকথিত 'হলুদ রেখা'র ওপারে ইসরাইলি বাহিনীর পূর্ণ প্রত্যাহার তখনই হবে, যখন হামাস অস্ত্রসংবরণের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করবে।

এ ক্ষেত্রে হালকা ও ভারী অস্ত্রের পাশাপাশি হামাসের সুড়ঙ্গও অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে জানিয়েছে বোর্ডটি।

আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেছেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি ও হামলা বন্ধসহ অন্যান্য সম্মত শর্তের বিষয়টি বাদ দিয়ে বোর্ডের বিবৃতিতে শুধু অস্ত্রসংবরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ওই কর্মকর্তা জানান, গোষ্ঠীগুলো গত বৃহস্পতিবার সম্মত শর্তগুলোর প্রতি নিজেদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। একই সঙ্গে বোর্ডের সর্বশেষ বিবৃতি নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

অক্টোবরের ৭ তারিখে হামাসের অভিযানকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া প্রায় দুই বছরের যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে গাজার বিস্তীর্ণ এলাকা এখনো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ফিলিস্তিনিদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক ইসরাইলি হামলা যুদ্ধবিরতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকেও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

চিকিৎসকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সোমবার গাজা শহরে একটি গাড়িতে ইসরাইলি বিমান হামলায় দুজন নিহত হয়েছেন। এর আগে রবিবার গাজা শহরের একটি অ্যাপার্টমেন্টে ইসরাইলি হামলায় এক দম্পতি ও তাদের সন্তান নিহত হন। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, এসব হামলায় সশস্ত্র ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।

ইসরাইলি বাহিনী গাজা উপত্যকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ ও জনশূন্য করে ফেলেছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে ২০ লাখের বেশি বাসিন্দার প্রায় সবাই উপকূলীয় একটি সংকীর্ণ এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের বেশিরভাগই অস্থায়ী তাঁবু কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত ভবনে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

৩২ বছর বয়সী আয়া মোহাম্মদ জাকি রয়টার্সকে ফোনে বলেন, 'মনে হচ্ছিল যুদ্ধ আবার শুরু হয়ে গেছে। প্রতি ঘণ্টায়, কখনো তারও কম সময়ে হামলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। গাজা উপত্যকার উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ–সব জায়গাতেই যুদ্ধবিমান হামলা চালিয়েছে।'

মধ্যস্থতাকারী দেশ মিশর, কাতার ও তুরস্ক গাজায় অব্যাহত ইসরাইলি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। এক যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেছে, এ ধরনের হামলা চুক্তির স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং এর দ্বিতীয় ধাপ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

'উচ্ছেদের অপেক্ষায়'

গত বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে প্রাথমিকভাবে গাজার প্রায় ৫৩ শতাংশ এলাকা ইসরাইলি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। পরে সেখান থেকে ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহারের কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে ইসরাইল নিয়ন্ত্রিত এলাকার পরিমাণ আরও বাড়িয়েছে।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কাটজ রবিবার জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গ খোঁজার কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসরাইলি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা ৬০ থেকে ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে।

৬০ বছর বয়সী সোমাহ দাওলা জানান, ইসরাইলি বাহিনী সীমানা চিহ্নিত করতে যে হলুদ ইট বসিয়েছে, সেগুলো তার বাড়ির আরও কাছে সরিয়ে আনা হয়েছে। এতে তিনি বুঝতে পারেন, ইসরাইলি নিয়ন্ত্রিত এলাকা তার বাড়ির দিকে আরও সম্প্রসারিত হয়েছে।

দাওলা বলেন, 'আমরা যেকোনো মুহূর্তে উচ্ছেদের অপেক্ষায় আছি। আমাদের পুরো জীবন শেষ, ভবিষ্যৎ শেষ, আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎও শেষ।'

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজার অধিকাংশ পরিবারের মতো দাওলার পরিবারও বহুবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তার চারপাশের ধ্বংসস্তূপ একসময়কার বসতিপূর্ণ গাজা শহরের একটি এলাকার চিত্র তুলে ধরছিল। কাছেই একটি তাঁবুর মেঝেতে তার নাতি-নাতনিরা প্লাস্টিকের খেলনা নিয়ে খেলছিল। স্বামীর সঙ্গে থাকার জন্য ওই তাঁবুকেই অস্থায়ী আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি।

দাওলা জানান, ট্রাম্পের ঘোষণা শুনে তিনি পরিবর্তনের আশা করেছিলেন। কিন্তু তার ভাষায়, 'উল্টো ধ্বংস আর উচ্ছেদই বেড়েছে।'

সাতজন স্থানীয় বাসিন্দা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, সম্প্রতি ইসরাইলের 'হলুদ রেখা' সম্প্রসারণের কারণে গাজা সিটি, দেইর আল-বালাহ ও খান ইউনিসসহ গাজা উপত্যকার অন্তত পাঁচটি এলাকার বাসিন্দাকে নতুন করে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় কার্যালয় (ওসিএইচএ) গত ২০ জুলাই প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানায়, ইসরাইলি উচ্ছেদ আদেশের কারণে পূর্ব গাজা শহরে 'হলুদ রেখা'র কাছাকাছি এলাকা থেকে অন্তত ৩০টি পরিবারকে সরে যেতে হয়েছে।

চুক্তি বাস্তবায়নের অন্যতম শর্ত হিসেবে হামাস দাবি করেছে, গত অক্টোবরের যুদ্ধবিরতির পর ইসরাইল যেসব এলাকা দখল করেছে, সেখান থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহার করতে হবে।

হামাস 'অস্ত্রসংবরণ' শব্দটি প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে তারা জানিয়েছে, ইসরাইল অভিযান বন্ধ করে গত বছরের যুদ্ধবিরতি অনুযায়ী সেনা প্রত্যাহার করলে মার্কিন সমর্থিত ফিলিস্তিনি প্রশাসনের অধীনে সংরক্ষণের জন্য তারা তাদের অস্ত্র হস্তান্তর করতে প্রস্তুত।

নেতানিয়াহুর কার্যালয়ের এক মুখপাত্র রয়টার্সকে জানিয়েছেন, অস্ত্রসংবরণ পরিকল্পনা নিয়ে ইসরাইল ওয়াশিংটনের কাছে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে।

মুখপাত্র ডোরন স্পিলম্যান বলেন, 'ইসরাইলের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হলো, হামাস সম্পূর্ণ ও সত্যিকার অর্থে অস্ত্রসংবরণ না করা পর্যন্ত কোনো কিছুই এগিয়ে নেওয়া যাবে না।'

গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের হিসাবে, অক্টোবরে ট্রাম্প সমর্থিত গাজা শান্তি পরিকল্পনায় সম্মতি দেওয়ার পর থেকে ইসরাইলি হামলায় অন্তত ১ হাজার ২৩০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক বলে দাবি করা হয়েছে।

অন্যদিকে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষের হিসাবে, একই সময়ে গাজায় চারজন ইসরাইলি সেনা নিহত হয়েছেন। ■

হামদর্দ
বাংলাদেশ
1st
TIME IN
BANGLADESH
আসল আমের পাল্প থেকে তৈরি
হামদর্দ
আমরূপালি
ফ্রুট সিরাপ
Real magic in every drop
বারবার খেলেও ঘোর কাটে না
BANGLADESH
حلال
হালাল
HALAL
ISLAMIC FOUNDATION
BSTI
বি ডি এস ৫২৮
১০০% ন্যাচারাল
প্রস্তুত প্রণালি
১ গ্লাস পানিতে ২ টেবিল চামচ
আমরূপালি মিশিয়ে
সুস্বাদু শরবত তৈরি করুন...
চিনি মেশানোর প্রয়োজন নেই...
Hamdard
Amrupali
Fruit Syrup
৭৫০ মিলি ও
৩০০ মিলি
বোতলে
বাজারে
পাওয়া যাচ্ছে
/hamdardbd
/hamdardtvbd
www.hamdard.tv
www.hamdard.com.bd